Approved by the Hon'ble D. P. I. Bengal, as a Text-book for class VI of High and M. E. Schools in Dacca, Rajshahi and Chittagong Divisions.
(Vide Calcutta Gazette 23rd August, 1922.)

জ্ঞান-সোপান।

—:o:—

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

"প্রকৃতি-পরিচয়", "গাছপালা", "পোকামাকড়", "বৈজ্ঞানিকী"
ও "প্রাকৃতিকী" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর,

আশুতোষ লাইব্রেরী,

৩৯।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাটুয়াটুলী—ঢাকা। অন্দরকিল্লা—চট্টগ্রাম।

১৩৩০

মূল্য ॥১০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

পদ্যাংশ

জ্ঞান-সোপান।

মহারাজ অশোক।

প্রিয়দর্শী অশোকের তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও ত্যাগশীল ভূপতি জগতের ইতিহাসে বিরল। ধর্ম্ম ও সুনীতির বহুল প্রচার এবং মানব-সমাজের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল-সাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। এই জন্য সাইবিরিয়া হইতে সিংহল পর্য্যন্ত এসিয়া মহাদেশের সমগ্র ভূভাগে গৃহে গৃহে তাঁহার যশোগাথা অদ্যাপি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য হিমগিরি হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সর্ব্বাংশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে পারস্য, এশিয়া-মাইনর, তিব্বত, চীন প্রভৃতি নানা দেশে তিনি বহু প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত অশোক মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার দানে আতপ-তাপিত পথিকের জন্য পথি-পার্শ্বে ছায়াতরু রোপিত ও বিশ্রামভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল; এবং তাঁহার অর্থে অসহায় ব্যাধিগ্রস্ত মানব ও গৃহপালিত পশুদিগের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বাংশে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

অতুল প্রতাপান্বিত ভূপতি হইয়াও তিনি ভোগবিলাস বিসর্জ্জন করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি ভিক্ষুর ন্যায় সামান্য কাষায়বস্ত্র পরিধান করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ইৎসিং অশোকের মৃত্যুর প্রায় সহস্র বৎসর পরে ভারতভ্রমণ-সময়ে ভিক্ষুবেশধারী প্রিয়দর্শীর খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পুণ্য জীবনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ তিনি তাহার উন্নতিবিধানের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। পুত্র, কলত্র. বিত্ত, রাজপদ, এমন কি, প্রাণ অপেক্ষাও ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়তর ছিল। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র, মহেন্দ্র ও প্রিয়তমা দুহিতা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী আজীবন ভিক্ষুধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রচার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের বহুল বিস্তারের নিমিত্ত তিনি অজস্র অর্থ দান করিতেন বলিয়া তাঁহার অপূর্ব্বদানশীলতা সম্বন্ধে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহাদের একটি এইরূপ;—বৌদ্ধধর্ম্মের

প্রচারকল্পে অশোক দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি রাজকার্য্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ধর্ম্মার্থে তাঁহার নয় কোটি যাট লক্ষ টাকা মাত্র ব্যয়িত হইয়াছে; সেইজন্য তখনও তিনি প্রতিদিন রাজভাণ্ডার হইতে প্রভূতপরিমাণ রজত ও কাঞ্চন "কুক্কুটারাম" নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুনিবাসে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পৌত্র সম্পদি যুবরাজ ছিলেন। মন্ত্রিবর্গ তাঁহাকে জানাইলেন যে, মহারাজ অশোকের অমিতদানে রাজভাণ্ডার অবিলম্বে শূন্য হইবে, এবং তিনি অর্থবল-হীন হইয়া অদূর ভবিষ্যতে এমন হীনাবস্থাপন্ন হইবেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে কোন-ক্রমেই তাঁহার জয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

যুবরাজ এই কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। রাজার আদেশানুসারে অর্থব্যয় করিতে কোষাধ্যক্ষকে নিষেধ করিলেন। এইরূপে আর অর্থলাভের আশা না থাকিলেও অশোক সঙ্কল্পিত দানকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার ব্যবহার্য্য স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রগুলি একটি একটি করিয়া সাধু-নিবাসে পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরে কাঞ্চন, রৌপ্য, এমন কি, লৌহপাত্রগুলিও নিঃশেষ হইল।

যখন অশোকের দান করিবার আর কিছুই রহিল না, তখন তিনি শোকসন্তপ্ত চিত্তে মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "অমাত্যগণ, এই রাজ্যের রাজা কে?"

সচিবগণ অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন, "প্রভো, আপনিই এই রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর।"

মন্ত্রিগণের এইরূপ প্রতিবচন শ্রবণ করিয়া অশোক অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না. না, তোমরা শিষ্টাচার প্রদর্শনের জন্য আর আমাকে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করিও না, আমি রাজগৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। তোমরা একবার চাহিয়া দেখ, ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিবার জন্য এই অর্দ্ধখণ্ড আমলক ব্যতীত সম্রাট্ অশোকের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

এই বলিয়া সম্রাট্ সেই আমলকখণ্ড সাধুদিগকে প্রদান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"এই আমলকখণ্ডই ভিক্ষুসঙ্ঘে আমার শেষ দান। আপনারা সকলে এই শেষ দানের অংশ গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজশ্রী ও রাজশক্তি আমাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং শরীর শীর্ণ হইয়াছে; আত্মীয়গণের প্রণয় ও স্বজন-বর্গের সাধু ব্যবহারে আমি আর অধিকারী নহি।"

ধর্ম্মভীরু রাজার এইরূপ পরিতাপবাক্যেও মন্ত্রিগণ রাজ-কোষ হইতে ধর্ম্মার্থে আর অর্থব্যয়ের কোনও ব্যবস্থা করিলেন না। কিন্তু অশোকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে. প্রজাগণের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যে ব্যয়, তাহা অপব্যয় নহে। ঐহিক ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী, ধর্ম্মই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের পরম আশ্রয়। এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ তিনি রাজকোষ হইতে সদ্ব্যয়ের জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

এক দিন তিনি তাঁহার প্রধান সচিব রাধাগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মন্ত্রিবর, এই রাজ্যের অধীশ্বর কে?"

রাধাগুপ্ত যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আপনিই এই রাজ্যের প্রভু।"

অশোক মন্ত্রীর তাদৃশ প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া ধীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আমি যদি এই রাজ্যের অধীশ্বর, তবে এই বিবিধ ধনরত্নশালিনী ভূতধাত্রী ধরণী আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলাম। জল-প্রবাহের ন্যায় চঞ্চল ঐশ্বর্য্য আমার অভিলষিত নহে, ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব আমি কামনা করি না। সাধুগণের সদা-বাঞ্ছিত চিত্তের শান্তিই আমার একমাত্র কাম্য ধন। এই দান সেই অভীষ্ট সাধনে আমার আনুকূল্য করুক।"

এই কথা বলিয়া তিনি যথারীতি দানপত্র স্বাক্ষর করিলেন। কথিত আছে যে, মহামতি অশোকের সঙ্কল্পিত দানের অবশিষ্ট চল্লিশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিয়া মন্ত্রিবর্গ অশোক-দত্ত রাজ্য পুনর্ব্বার সম্পদির জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন।

সবুক্তগীনের স্বপ্ন।

সবুক্তগীন আফগানিস্থানের অধীশ্বর ছিলেন; শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও ঔদার্য্যে তাঁহার নাম আফগানিস্থানের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখনও এ দেশ মুসলমানকর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। সবুক্তগীনের সহিত রাজপুতদিগের কয়েকবার ঘোর যুদ্ধ হয়।

সবুক্তগীন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ কমনীয় গুণরাজিতে মণ্ডিত ছিল। মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে যেরূপ নানাজাতীয় ভীষণ জলজন্তু ও অশেষবিধ বহুমূল্য রত্নরাজি একত্র অবস্থান করে, এই নরপতির অন্তঃকরণেও এক দিকে বীরজনোচিত কঠোর গুণাবলি এবং অপর দিকে দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি কোমল গুণসমূহের একত্র সমাবেশ হেতু তিনি সকল শ্রেণীর লোকের বরণীয় হইয়াছিলেন।

কথিত আছে সমগ্র আফগানিস্থানের রাজপদ লাভ করিবার পূর্ব্বে সবুক্তগীন এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যজাতির নেতা ছিলেন। পর্ব্বতবিহারী জাতিসমূহ প্রায়ই অত্যন্ত দরিদ্র হয়, সবুক্তগীন দলপতি হইলেও এরূপ নিঃস্ব ছিলেন যে, তাঁহার একাধিক ঘোটক ছিল না। তিনি মৃগয়া দ্বারা জীবনাতিপাত করিতেন।

একদিন মৃগয়াকালে সবুক্তগীন একটী ক্ষুদ্র মৃগশিশু লাভ করেন। ঐ মৃগশিশুর মাতা তখন অদূরে নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করিতেছিল। অশ্বের পদশব্দ কর্ণগোচর হইলে মৃগী ফিরিয়া দেখিল যে, তাহার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানটিকে একজন বীরপুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছে। ঐ বীরপুরুষের পৃষ্ঠলম্বিত ধনুর্ব্বান দেখিয়াও সন্তানের মমতায় মৃগী নিজ জীবনের আশঙ্কা না করিয়া, দরিদ্র যেরূপ ভিক্ষার্থী হইয়া সকরুণনয়নে ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, সেইরূপ সবুক্তগীনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বিপন্ন শিশুর অমঙ্গল চিন্তায় অধীরা মৃগীর অবস্থা দর্শন করিয়া, সবুক্তগীনের স্বভাবকোমল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইল; তিনি মৃগশিশুটিকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন, এবং সেও এক দৌড়ে নিজ মাতার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন দৈন্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতার ছায়া মৃগীর চক্ষে প্রতিফলিত হইল; বোধ হইল, সে প্রাণ ভরিয়া সবুক্তগীনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সবুক্তগীনের মৃগয়া সে দিন নিষ্ফল হইলেও সেই মাতৃমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিল, এবং পুণ্যজনিত আনন্দে তাঁহার হৃদয় এরূপ পূর্ণ হইল যে, পরদিনের উদর-চিন্তা তথায় প্রবেশ করিতে পারিল না।

সেই দিন নিশীথকালে সবুক্তগীন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন এক অসীম শোভাময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,—সেখানে কেবল আনন্দ;—দুঃখের লেশমাত্র নাই। উজ্জ্বলাবয়ব

পরীগণ তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে—এবং তাহাদের গাত্রের সৌরভে চতুর্দ্দিকের বায়ু সুরভিত হইতেছে। কতক্ষণ পরে পরীগণ তাঁহাকে এক মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত করিল; সবুক্তগীন বিস্ময়, আনন্দ ও ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া শুনিলেন, সেই মহাপুরুষ—স্বয়ং হজরত মহম্মদ। পয়গম্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সবুক্তগীন, তুমি আজ মৃগীর প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে জগতের অধীশ্বর খোদাতালা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার দরবারে তোমার নাম পৃথিবীর প্রধানতম রাজগণের নামের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তুমি মহাপ্রতাপশালী রাজা হইবে। অদ্য তুমি মৃগী ও মৃগশিশুর প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছ, রাজপদ লাভ করিয়া প্রজাগণের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিও। তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গেও রাজসুখে বঞ্চিত করিবেন না।"

সবুক্তগীনের স্বপ্ন যে সফল হইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

রাজকুমারের শিক্ষা।

(বৌদ্ধ "জাতক" গল্পমালা হইতে)

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত নামে এক প্রবলপরাক্রম নরপতি কাশী-রাজ্যের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই সময়ে এক অসীম-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-তনয় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একদিন এই মনস্বী সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঘটনাক্রমে মহারাজ ব্রহ্মদত্তের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসীর অসামান্য প্রতিভা মহারাজ ব্রহ্মদত্তের অবিদিত ছিল না। তিনি পরম আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে নিজ উদ্যানবাটিকাতে আহ্বান করিয়া কিয়ৎ-কাল তথায় বাস করিবার জন্য তাঁহাকে সানুনয় অনুরোধ করেন। সন্ন্যাসী তাহাতে সম্মত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদত্তের এক অত্যন্ত দুর্বিনীত পুত্র ছিল। শৈশব হইতেই দুষ্ট ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে "দুষ্টকুমার" এই নাম দিয়াছিল। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার দৌরাত্ম্য এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহা অসহ্য বোধ করিতে লাগিল। জ্ঞাতিবর্গ, অমাত্যগণ বা স্বয়ং মহীপতিও এই দুঃশীল ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত কুমারকে দমন করিতে পারিলেন না। অমাত্যবর্গের সহিত নাগরিকগণও সুযোগ পাইলেই কুমারকে

সদুপদেশ দিত, কিন্তু কুমার তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিত না। তাহারা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নিষেধ করিলেও কুমার সে দিকে দৃক্‌পাত করিত না। ব্রহ্মদত্ত পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; অবশেষে স্থির করিলেন যে, সেই সন্ন্যাসী ব্যতীত কেহই তাঁহার পুত্রকে বিনীত করিতে পারিবেন না। তদনুসারে তিনি সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন, এবং সন্ন্যাসীও রাজকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তৎসহ উদ্যানে প্রত্যাগমন করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রথমে কুমারের রুচি ও অভিপ্রায়ে বাধা না দিয়া বরং তাহার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; এইরূপে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্দ জন্মিল। ক্রমে সন্ন্যাসীর বাক্যে কুমার আস্থা স্থাপন করিতে লাগিলেন। একদিন সন্ন্যাসী কুমারকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি নিম্ববীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং তাহার দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র পত্র বহির্গত হইয়াছে। তিনি কুমারকে বলিলেন—'কুমার, একবার দেখ ত ইহার রস কিরূপ?' কুমার একটি পত্র ছেদনপূর্ব্বক রসনাগ্রে নিক্ষেপ করিয়াই ঘোরতর তিক্তস্বাদ অনুভব করিয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বমনের উপক্রম হইল। সন্ন্যাসী কহিলেন—'কুমার, এ কি?' কুমার কহিলেন—'এই তরু এখনই হলাহল বিষের ন্যায়; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে না জানি ইহা কিরূপ হইবে! কত

লোক না জানিয়া ইহার ফল মুখে দিলে বিড়ম্বিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।” রাজকুমার এই বলিয়া সেই বীজটি ভূমিতল হইতে উৎপাটিত করিয়া করতল দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—“রাজকুমার, এই নবোদ্গত নিম্বাঙ্কুর এখনই বিষোপম, পরিণামে না জানি ইহা কিরূপ ভয়ানক হইবে, এই ভাবিয়া তুমি যেমন ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে, সেরূপ তোমার পিতার প্রজাগণও তোমার সম্বন্ধে মনে করিতেছে যে, তুমি শৈশবেই এতাদৃশ দুঃশীল হইয়া উঠিয়াছ, বড় হইয়া রাজ্য লাভ করিলে না জানি তুমি কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। তাহারা ভাবিতেছে যে, তোমার আশ্রয়ে বাস করা তাহাদের নানারূপ দুঃখ ও অশান্তির কারণ হইবে। সেই জন্য তাহারা তোমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে, এমন কি, কেহ কেহ এখন তোমার প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব এখন হইতে দুঃশীলতা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হও।”

সন্ন্যাসিপ্রদত্ত দৃষ্টান্ত নিষ্ফল হইল না। দুর্ব্বৃত্ত রাজকুমার উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন, স্বভাবের দোষগুলি অল্পবয়সে সংশোধন না করিলে পরিণামে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও আত্মপর সকলেরই অশেষ দুর্গতির কারণ হইতে পারে। তদবধি “দুষ্টকুমার” অত্যন্ত সুশীল হইলেন এবং মনোযোগপূর্ব্বক বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

ভারতের প্রাকৃতিক সংস্থান।

ভারতবর্ষ প্রকৃতির এক অতি বিশাল ও অতি বিচিত্র লীলাভূমি। ইহার কোথাও উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা, কোথাও বা বিস্তীর্ণ গ্রীষ্মপ্রধান মালভূমি; কোথাও বারিহীন বালুকাময় মরুস্থলী, কোথাও বা নদনদীসেবিত শস্যশ্যামল ভূভাগ; কোথাও সমৃদ্ধ জনাকীর্ণ নগরী ও জনপদরাজি, কোথাও বা ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্য। ইহার দৈর্ঘ্য কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কাশ্মীরের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র মাইল এবং প্রাশস্ত্যও ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বসীমা হইতে বেলুচি-স্থানের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত প্রায় তৎপরিমাণ। এই বিশাল দেশের নানা ভাগে নানা জাতীয় লোক বাস করে; আচার, ব্যবহার, ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে নানারূপ প্রভেদ বর্ত্তমান। ভারতের নানা প্রদেশের জলবায়ুর প্রকৃতিও ভিন্ন। এই সকল কারণে কোনও কোনও লেখক ভারতবর্ষকে এক স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

বিন্ধ্য পর্ব্বত ও সাতপুরা পর্ব্বত-শ্রেণী মেখলার ন্যায় ভারত-ভূমির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধ (উত্তর) ও অধঃ (দক্ষিণ) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ঊর্দ্ধভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। অধোভাগের নাম দক্ষিণাপথ। মানচিত্রের
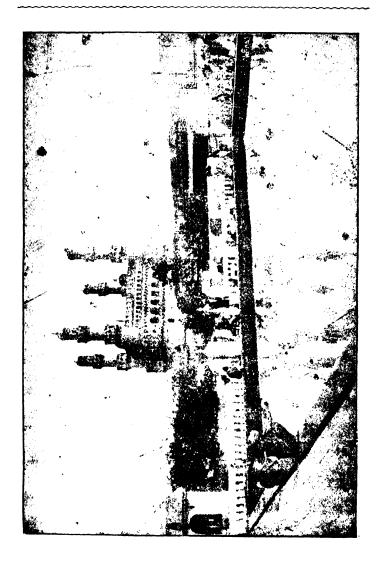
প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় যেন ভারতের দক্ষিণভাগ জলধির জলে অবগাহন করিবার জন্য ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই অংশ ত্রিভুজাকার এবং উন্নত ও স্থানে স্থানে বন্ধুর।

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হাইদ্রাবাদ ও মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য এই বিশাল ও উন্নতাবনত উচ্চ ভূভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমান্তের পর্ব্বতশ্রেণী উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া হিমালয়ের পাদপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সমতল ভূভাগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমেও পর্ব্বতের অভাব নাই; পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট-নামক শৈলশ্রেণী দক্ষিণ ভারতকে প্রাচীরবৎ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বঘাটের উচ্চতা সাগর-পৃষ্ঠ হইতে গড়ে সহস্র ফুট; কিন্তু পশ্চিমঘাটের উচ্চতা আট হাজার ফুট। দক্ষিণাপথের উচ্চ ভূভাগ পশ্চিমঘাট হইতে ক্রমনিম্ন হইয়া পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই জন্য এই অংশের অনেক নদীও পূর্ব্ববাহিনী।

হিমালয়ের পাদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া যে ভূভাগ উত্তর ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তাহাকে এক প্রকার সমতলই বলা যাইতে পারে। ইহারই মধ্যাংশে যুক্তপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব, রাজপুতানা ও সিন্ধু প্রদেশ, এবং উত্তর-পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও আসাম অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু প্রভৃতি নদ এবং গঙ্গা প্রভৃতি নদীর প্রবাহ এই পাঁচলক্ষ বর্গ মাইল-পরিমাণ বিশাল ভূভাগের সরসতা ও উর্ব্বরতা সাধন করিতেছে।

কাশ্মীরের দৃশ্য।

এই সরস উর্ব্বর ভূভাগে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই প্রদেশেই প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান-সভ্যতার ধারাযুগল প্রবাহিত হইয়া বিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্পকলায় ইহা সমগ্র ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা নগরী এবং ঢাকা, শিলং, দারজ্জিলিং নাইনিতাল, সিমলা প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক সমৃদ্ধ নগরগুলিও এই প্রদেশে অবস্থিত। এই জন্য ইহাকে আধুনিক সভ্যতারও লীলাভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। মধ্য-প্রদেশ ও দক্ষিণাপথের পর্ব্বতসঙ্কুল অসম ভূভাগকে প্রকৃতি দেবী যে সকল আভরণে সজ্জিত করিয়া এত রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন, উত্তরভারত তাহা লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু ইহার প্রায় সমতল বক্ষের উপর দিয়া যে অমৃতনিস্যন্দিনী গঙ্গা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু প্রভৃতি নদ শত বাহু বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারাই এই সমতল ভূভাগের বৈচিত্র্য-বিধানের পক্ষে যথেষ্ট।

দক্ষিণভারতে গঙ্গার ন্যায় দীর্ঘ নদী নাই। কিন্তু নর্ম্মদা নামে যে স্বচ্ছতোয়া নদী অমরকণ্টকে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সাতপুরা ও বিন্ধ্যাপর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বোম্বাই প্রদেশকে ধনধান্যশালী করিয়াছে, উত্তরভারতের গঙ্গার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। গঙ্গার ন্যায় ইহারও উভয় কূলে অসংখ্য দেবমন্দির বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত অনেক পৌরাণিক ঘটনার সহিত এই নদীর নাম জড়িত থাকায়, হিন্দুগণ ইহাকে

গোদাবরী তীরে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ।
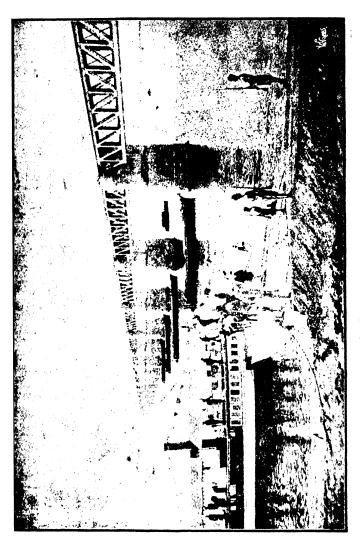
গঙ্গার ন্যায় পূতসলিলা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। জব্বলপুরের নিকটে নর্ম্মদাবক্ষ ভেদ করিয়া এক মর্ম্মর পর্ব্বত দণ্ডায়মান আছে। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লী, ফতেপুর-শিক্রি, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদিগের কীর্ত্তি এবং সিমলা, দারজিলিং, কলিকাতা প্রভৃতি ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত স্থানের সৌন্দর্য্যের ন্যায় জব্বলপুরের মর্ম্মরপর্ব্বতও বিদেশীয় পর্য্যটকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মনোহরণ করিয়া থাকে। খরপ্রবাহা তাপ্তী নদীর উভয় কূলের দৃশ্যও পরম মনোরম।

দক্ষিণভারতের অপর নদীসমূহের কথা মনে করিলে নর্ম্মদা ও তাপ্তীর পরেই গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর কথা স্মরণপথে উদিত হয়। গোদাবরীই এই প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নদী। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া এই স্রোতস্বতী নিজাম বাহাদুরের রাজ্য ভেদ করিয়া ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা যে কত তৃণগুল্মহীন শুষ্ক প্রান্তর ভেদ করিয়া, এবং কত দুর্গম আরণ্যভূমির শ্যামল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। গোদাবরীতে বৎসরের সকল সময় গভীর জল থাকে না বলিয়া জলযানে গমনাগমনের সুযোগ নাই। রাজমহেন্দ্রী হইতে পঁচিশ মাইল দূরে গোদাবরীর দৃশ্য অতি চমৎকার। নদীতীরবর্ত্তী শৈলশ্রেণীর উপরে নিবিড় বেণুবন এবং ঘনসন্নিবিষ্ট প্রাচীন সেগুন, তিন্তিড়ী ও ডুম্বুর-জাতীয় বৃক্ষ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া

রহিয়াছে। ইউরোপের রাইন্ নদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু গোদাবরীর এই অংশের সৌন্দর্য্য রাইনের শ্রীকেও পরাভব করিয়াছে।

কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীদ্বয়ও ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত শৈলশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কোন নদীই গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় গভীর নয়। ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি নদী দূর দূরান্তর হইতে জলরাশি বহন করিয়া কৃষ্ণায় যুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহা বঙ্গদেশের নদীর ন্যায় পূর্ণতোয়া হয় নাই। মসলিপট্টম নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান নগর এই নদীর নিকটে অবস্থিত।

পুরাণপ্রসিদ্ধ কাবেরী নদী মহীশূর রাজ্য ভেদ করিয়া এবং ইতিহাসবিখ্যাত শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গমূল ধৌত করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবমানা। বোধ হয় সৌন্দর্য্যে ভারতের কোন নদী কাবেরীর সমকক্ষ নয়। মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোরের নিকটে কাবেরীর যে জলপ্রপাত আছে, তাহা ভারতের একটি দর্শনীয় বস্তু।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণাপথে উর্ব্বরা ভূমির প্রাচুর্য্য না থাকিলেও কুমারিকা অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূভাগ পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উর্ব্বরা শক্তি নিতান্ত অল্প নহে। এই ভূখণ্ডে ইক্ষু, ধান্য, তামাক ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মান্দ্রাজ, আরকট, পণ্ডিচেরী, ত্রিচিনোপলি প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর

এই অংশেই অবস্থিত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর পাদতল স্পর্শ করিয়া যে উর্ব্বর ভূখণ্ড উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাই মালবদেশ। এই ভূভাগে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, এবং নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অরণ্যে প্রচুর সেগুন ও চন্দন কাষ্ঠ জন্মে।

দক্ষিণাপথের নীলগিরি আর একটি উল্লেখযোগ্য মনোরম স্থান। যে ত্রিভুজাকার উচ্চ পার্ব্বত্যভূমি লইয়া দক্ষিণ ভারত গঠিত, তাহারই দক্ষিণ প্রান্তে এই গিরিশ্রেণী অবস্থিত। হিমালয় বা আল্‌প্‌স্ প্রভৃতি পর্ব্বতের ন্যায় ইহা উচ্চ না হইলেও, যে নিবিড় অরণ্য ও লতাপুষ্পফলে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমগ্র বৎসর আবৃত থাকে, তাহাই ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। উতকামণ্ড নামক প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস এই পর্ব্বতের উপরেই অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য হিমালয়ের উচ্চ অংশ, কাশ্মীর ও নেপাল প্রভৃতির প্রসিদ্ধি থাকিলেও ঐ স্থানগুলি দুর্গম বলিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য সাধারণের উপভোগ্য হয় না; এই কারণে উতকামণ্ড বা তাহার সন্নিহিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ জনসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে।

উত্তর ভারতের বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ নদনদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস পর্ব্বতের পাদমূলে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের উপর দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে। তিব্বতে ইহা সান্-পো নামে খ্যাত। আসামের সদিয়ার নিকট হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহা ডিহাঙ্গ নামে
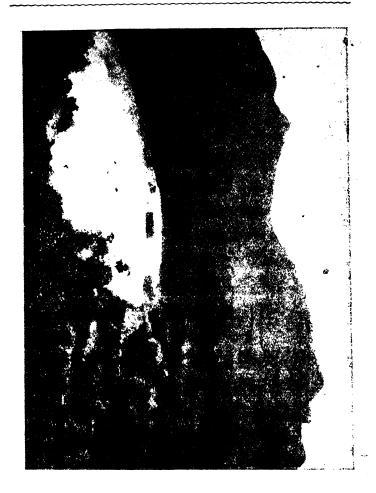
পরিচিত। পরে ডিবাঙ্গ ও লোহিত নদীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া তিব্বতের সেই ক্ষীণকায় সান্-পো নদ আসামে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই বহুরূপী নদের যে অংশকে আমরা ব্রহ্মপুত্র বলি, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় সার্দ্ধ চারি শত মাইল। শত বাধা অতিক্রম করিয়া এবং উচ্চ ভূমি ধৌত করিয়া ইহা যে ভূভাগের কত বৈচিত্র্যবিধান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ইহার উভয় কূলের দৃশ্যও পরম মনোরম। আসাম ত্যাগ করিবার কালে ব্রহ্মপুত্র গারো পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, এবং পরে দেড় শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইহা গোয়ালন্দের নিকট গঙ্গা অর্থাৎ পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এই অংশ যমুনা নামে খ্যাত। ইহার পর বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন মেঘনা নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়া উহা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সঙ্গম-স্থলে ব্রহ্মপুত্রের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের যে সকল শুষ্ক স্থান দিয়া গঙ্গা ও সিন্ধুর ক্ষীণধারা প্রবাহিত, খাল খনন করিয়া নদীর জল চারিদিকে লইয়া না গেলে তথায় কৃষিকার্য্য চলে না। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের জলরাশিকে সে প্রকারে কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। হিমালয় ও আসামের উচ্চ স্থান হইতে ইহার প্রবাহের

বিস্তীর্ণ ভূমির উপরে সঞ্চিত হইয়া প্রতি বৎসরেই ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে থাকে।

সমুদ্রতীর হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় চারি শত ক্রোশ। এই দীর্ঘ জলপথে বাষ্পীয় পোত ও নৌকা বৎসরের সকল সময়েই গমনাগমন করিতে পারে। ব্যবসায়িগণ আসাম হইতে চা, কাষ্ঠ, তূলা এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাট, তামাক ও ধান্যাদি শস্য এই সুযোগে নানা দেশে প্রেরণ করিয়া এবং বিদেশ হইতে নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বদেশে আনয়ন করিয়া দেশের যথেষ্ট ধনবৃদ্ধি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিতেছেন।

মক্কানগরীর প্রতিষ্ঠা।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগুরু মহাত্মা হজরত মহম্মদ আরব দেশে মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা প্রতিবৎসর জগতের সহস্র সহস্র মুসলমান তীর্থদর্শনমানসে পুণ্যভূমি মক্কা নগরীতে গমন করিয়া থাকেন। হজরত মহম্মদের জন্মের সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীর চিহ্নমাত্র ছিল না।

কথিত আছে, হজরত মহম্মদের পিতৃপুরুষগণের বংশে এব্রাহিম নামক জনৈক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই স্ত্রী,—সারা ও হাজেরা। পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহরাশি হাজেরার পুত্র ইস্‌মাইল সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বামীর এরূপ স্নেহাধিক্য দর্শন করিয়া সারা শিশুটির বিরুদ্ধে নানা কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই কুমন্ত্রণার ফলে এব্রাহিম, পত্নী হাজেরা ও পুত্র ইস্‌মাইলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং উভয়কে আধুনিক মক্কার নিকটবর্ত্তী জনশূন্য মরুপ্রান্তরে নির্ব্বাসন করিলেন; নির্ব্বাসনকালে কিছু খোরমা ফল ও কয়েকটি জলপূর্ণ পাত্র তাহাদের সঙ্গে দিলেন।

চারিদিক জনশূন্য তপ্তবালুকাময় সামাহীন প্রান্তর;—কোন স্থানে জলাশয়, বা আতপতাপে তাপিত পথিকের বিশ্রামের জন্য একটিও ছায়াতরু, কিংবা জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই। নির্ব্বাসিতা হাজেরা একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র ইস্‌মাইলকে আপন স্নেহময় বক্ষে ধারণ করিয়া একাকিনী এই ভীষণ

নির্জ্জন প্রান্তরে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশুর জীবননাশের আশঙ্কা জননীর হৃদয়ে প্রবলতর হইতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সঙ্গে যে পানীয় জল ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন মাতা-পুত্রের তৃষ্ণানিবারণেরও কোন উপায় রহিল না।

মনুষ্যের অদৃষ্ট যখন অপ্রসন্ন হয়, তখন চারিদিকে বিপদ্‌-রাশি যেন ঘনীভূত হয়। হাজেরা পিপাসায় অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শিশুপুত্রের প্রাণও প্রায় ওষ্ঠাগত হইল। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া জল অন্বেষণ করাও সুসাধ্য নহে। উভ-য়ের শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল এবং তৎসঙ্গে তৃষ্ণা প্রবলতর হইতে লাগিল; হাজেরা কাতরপ্রাণে ঈশ্বরের নিকট করুণাভিক্ষা করিলেন, এবং দুঃখের ধন একমাত্র শিশুপুত্রটিকে তাঁহারই আশ্রয়ে রাখিয়া জলান্বেষণে বহির্গত হইলেন।

অবসন্নদেহে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ দূরে নিভৃত স্থানে একটি নির্ঝর দেখিতে পাইয়া হাজেরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ঈশ্বরোদ্দেশে মস্তক অবনত করিলেন; এবং তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে অজস্র অশ্রুধারা তপ্তবালুকাময় ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। হাজেরার মনে হইল যেন পরমেশ্বরের করুণাধারাই দুঃসময়ে অনাথার জীবনরক্ষার জন্য নির্ঝরাকার ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য নির্ঝরটি তাঁহার কাছে এক রমণীয় পুণ্য-তীর্থ বলিয়া মনে হইল। তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত অবশ হৃদয় এই নির্ঝর-তীর এক্মাত্র বিশ্রামস্থান বলিয়া স্থির করিয়া লইল।

অতঃপর হাজেরা শিশু-পুত্রকে লইয়া এই নির্ঝর-সমীপবর্ত্তী এক ছায়াতরুতলে বাস করিতে লাগিলেন। একদা একদল বণিক্‌সম্প্রদায় এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। প্রখর সূর্য্যকিরণে ক্লান্ত ও তৃষাতুর হইয়া তাঁহারা সমীপবর্ত্তী বনে প্রবেশ করিলেন। নির্ঝর-তীরে আসিয়া সাধ্বী হাজেরার শান্তোজ্জ্বল সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত হইলেন; এবং সকলের মনেই রমণীর পরিচয় জানিবার আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। অথচ কেহই সেই তেজোময়ী নিশ্চলা প্রতিমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। বহুক্ষণ পরে তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি কে?" তপস্বিনী শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "বাবা আমি অনাথা মানবী। আমার স্বামী এই শিশুটির সহিত আমাকে নির্ব্বাসন করিয়াছেন; সংসারে আমি একান্ত নিরাশ্রয়া।"

বণিকসম্প্রদায় এই রমণীয় স্থান দর্শন করিয়া তথায় বসতি-স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, হাজেরা মানবী-বেশধারিণী দেবী। তাঁহারা এই নির্ঝরের নিকটে অবস্থান করিবার জন্য হাজেরার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হাজেরা সানন্দে কহিলেন, "তোমরা এখানে যথেচ্ছ ভূমি গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু এই নির্ঝরসন্নিহিত স্থানটুকু আমার অধিকারে রাখিও। নিতান্ত দুঃখের সময় আমি এই নির্ঝরটি দয়াময় বিধাতার অনন্ত করুণার উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে লাভ করিয়াছি; ইহাই আমাদের ম্রিয়মাণদেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে।"

বণিক্‌সম্প্রদায় সাধ্বী হাজেরার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া নির্ঝর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গৃহনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুণ্যবতী হাজেরাকে যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। বণিক্ প্রতিবেশিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিশু ইস্‌মাইল ও তাহার জননীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই মক্কানগরী-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয় এবং উত্তরকালে এই সাধ্বী রমণীর বংশেই ইস্‌লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের অসীম করুণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে পারিলে নদীসরোবরহীন মরুপ্রান্তরেও নির্ঝরের আবির্ভাব হয়, এবং জনহীন ভীষণ কান্তারেও সহায় আসিয়া দেখা দেয়।

মহাত্মা উইলিয়ম্ কেরী।

ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পরে যে সকল কল্যাণব্রত উদার-প্রাণ ইংরেজ বঙ্গদেশে বাস করিয়া বঙ্গবাসীদিগের সুশিক্ষা-বিস্তারে ও তাহাদের ভাষার উন্নতিসাধনে ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন, মহাত্মা উইলিয়ম্ কেরী তাঁহাদের অন্যতম।

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক দরিদ্রের গৃহে উইলিয়ম্ কেরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বস্ত্রবয়ন করিয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শৈশবেই পুত্রের অদম্য-জ্ঞানলাভেচ্ছা দর্শন করিয়া, তিনি তাঁহাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অধিক কাল পুত্রের পাঠের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, দারিদ্র্যপীড়িত পিতা পুত্রকে শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ মাতাপিতার গ্রাসাচ্ছা-দনের সাহায্য করা পুত্রের প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিয়া, কেরী বৃষ্টিবাত্যা অগ্রাহ্য করিয়া কৃষিক্ষেত্রে হলচালনায় প্রবৃত্ত হই-লেন। জ্ঞানলাভেচ্ছা উদ্রেক হইলে, তাহার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মানব সুখভোগ করিতে পারে না। দিবসব্যাপী শ্রমের পর সন্ধ্যায় অবসন্নদেহে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কেরী পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতেন।

এইরূপ কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কেরীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া এক চর্ম্মকারের গৃহে পাদুকানির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার

পাঠাভ্যাসের কিঞ্চিৎ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি সম্মুখে পুস্তক উন্মুক্ত রাখিতেন, এবং অধ্যয়ন ও উচ্চ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হস্ত দ্বারা কার্য্য করিতেন। প্রভুর গৃহে একখানি ছিন্ন "বাইবেল" ছিল। "বাইবেল" খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। অপর পাঠ্যগ্রন্থের সহিত এই ধর্ম্মগ্রন্থখানিও কেরী পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে খৃষ্টধর্ম্মের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, যে ব্যক্তি জগজ্জনের নিকটে ধর্ম্মকথা প্রচার করেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক। এই সময়ে তাঁহার উদার হৃদয়ে যে লোকহিত-সাধনস্পৃহার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান ছিল।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে দিবাভাগে স্বহস্তনির্ম্মিত পাদুকা স্কন্ধে লইয়া দূরবর্ত্তী নগর ও গ্রামে ক্রেতার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে হইত। অথচ তাঁহার জ্ঞানদান-স্পৃহা এতদূর প্রবল ছিল যে, তিনি রাত্রিযোগে স্বগ্রামস্থ নৈশ-বিদ্যালয়ে অল্পশিক্ষিত কৃষকযুবকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার প্রচুর আগ্রহ ছিল, নিজের একটী কন্যার মৃত্যুদিনেও তিনি হাস্যবদনে গ্রামবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ এইরূপ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, এই প্রকারে নানারূপ প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া উইলিয়ম্ কেরী নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

তিনি অৰ্দ্ধাশনে থাকিয়াও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে কেরীর নির্ম্মল চরিত্র, জ্ঞানলাভেচ্ছা ও অসামান্য ধর্ম্মজ্ঞানের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে জনৈক ধর্ম্মযাজক এক গ্রাম্য ভজনালয়ে প্রচারকার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কেরী, এই আহ্বানকে ঈশ্বরের আদেশবাণী মনে করিয়া বার্ষিক দশ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় শত টাকা বেতনে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে নানাগ্রন্থে ভারতবর্ষের বিবরণ পাঠ করিয়া, ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেরীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি ভারতে আসিবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের শাসন-ভার তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কোম্পানী সহজে কাহাকেও এ দেশে আগমন করিতে দিতেন না। ভারতাগমনের চেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হইতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এবং শেষে তিনি একখানি দিনেমার জাহাজের আরোহী হইয়া পত্নীপুত্রসহ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—৩৩ বৎসর বয়সে—ভারতে পদার্পণ করেন। তৎকালে সুয়েজ খাল ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিতে কেরীর প্রায় পাঁচ মাস লাগিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি বঙ্গভাষাশিক্ষায় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। কেরী রিক্তহস্তে আত্মীয়বন্ধু

মহাত্মা উইলিয়ম্ কেরী।

হীন নূতন দেশে আসিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন।

কি প্রকারে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিবেন, এই দুর্ভাবনা তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য আকুল করিয়াছিল। কিন্তু যাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, পরমেশ্বরই তাঁহাদের সহায় হন। কিয়ৎকাল মধ্যে মালদহ জেলায় মদনাবতী নামক স্থানে এক নীলকুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষের পদ হঠাৎ শূন্য হওয়ায়, কেরী সাহেব মাসিক দুইশত টাকা বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

কুঠীর কার্য্য শেষ করিয়া কেরী যথেষ্ট সময় পাইতেন, এবং এই অবসরে তিনি বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিতেন। তখন বাঙ্গালা ভাষায় কোন ভাল ব্যাকরণ ছিল না। কেরী বাঙ্গালা ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াই এই অভাবপূরণে মনোনিবেশ করিলেন। বিদেশীয়ের পক্ষে ইহা অসাধারণ ধীশক্তির পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্পকালের মধ্যে কেরী সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বাইবেলের অনুবাদ করেন।

মালদহ জেলার জলবায়ুর অবস্থা তখন ভাল ছিল না। কেরীর একটি পুত্র জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিলে, তিনি পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মালদহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর-নামক স্থানে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান্ নামক অপর দুইজন ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারক এদেশে আগমন করেন। কেরী সাহেবের দৃষ্টান্ত-

দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ইঁহারাও বঙ্গভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। এই তিন মহাত্মা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করিয়া এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালিগণ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ইঁহারা স্বহস্তে কাষ্ঠ ও ধাতুফলকে বাঙ্গালা অক্ষর খোদিত করিয়া সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রা যন্ত্রালয় স্থাপন করেন।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে যে সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, এক শত বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ একখানিরও অস্তিত্ব ছিল না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরী এবং মার্শম্যান সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় 'দিগ্‌দর্শন' নামক প্রথম মাসিকপত্র প্রকাশিত করেন। প্রথম বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র "সমাচারদর্পণ"ও মহাত্মা কেরী সাহেবের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়।

এ দেশের নিরক্ষর ও অশিক্ষিত কৃষিজীবিগণের মধ্যে বিজ্ঞানানুগত প্রথায় কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন করা কর্ম্মবীর কেরী সাহেবের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নানা দেশ হইতে বৃক্ষ ও বীজ সংগ্রহ করিয়া তিনি শ্রীরামপুরে একটি আদর্শ উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে দেশীয় সমাজের নানারূপ সংস্কার-কার্য্যেরও সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মহাত্মা কেরী শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন। আজিও শ্রীরামপুরে রাজপথের পার্শ্বস্থ
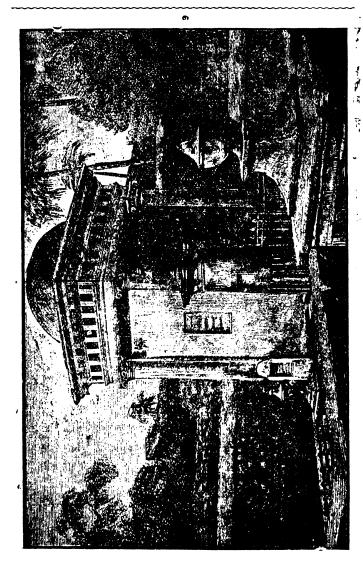
কেরী সাহেবের সমাধি স্তম্ভ।

কেরী সাহেবের সমাধিস্তম্ভটি তাঁহার উদার হৃদয়, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্যের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও সংবাদপত্র সমূহই কেরীর যথার্থ স্মৃতিস্তম্ভ। বঙ্গবাসিগণ তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী।

ইতর প্রাণীর বন্ধুতা

মনুষ্যজাতি নিসর্গ হইতে যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছে, ইতরপ্রাণিমণ্ডলী তাহার অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত। ভক্তি, সংযম, কৃতজ্ঞতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহ, এবং বাক্‌শক্তি ও সর্ব্ববিধ অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা-উদ্ভাবন করিবার শক্তি মানবজাতির নিজস্ব। বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি ও শক্তিই মনুষ্যকে ইতরপ্রাণীমণ্ডলী হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মানুষে সন্তানস্নেহ, বন্ধুতা, সহযোগিতা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, ইতরপ্রাণিগণও অল্লাধিক পরিমাণে তৎসমুদয়ের অধিকারী। এই পাঠে বিভিন্নজাতীয় প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বন্ধুতা-সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

হস্তিযূথ যখন দলবদ্ধ হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম-ত্রাণের চেষ্টা করে এবং পিপীলিকাসমূহ বা মধুমক্ষিকাগণ যখন

একত্র অবস্থানপূর্ব্বক আপনাদের অবস্থানের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করে, তখন তাহা দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করে না। কেননা দলবদ্ধ হইয়া বাস করাই ইহাদের স্বভাব; দলের কল্যাণ ব্যতীত ইহাদের একের কল্যাণ অসম্ভব।

কিন্তু যখন কোন গাভী মাতৃহীন মেষশাবকের দুঃখ দেখিয়া স্বীয় স্তন্যধারায় তাহাকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন অনুমান করিতে হয় যে, নিজের বা নিজ-জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত তাহার আরও দুই একটি সৎ-প্রবৃত্তি আছে।

পালনকর্ত্তার সহিত কুক্কুরের যে পরম বন্ধুতা হয়, তাহা আমরা আশৈশব প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর সহিত ইহাদের বন্ধুতার কথা কদাচিৎ কর্ণগোচর হয়।

অধ্যাপক লরেঞ্জো নামক জনৈক আমেরিকাবাসী, কুক্কুর, মার্জ্জার ও শশক প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণী এবং পারাবত, কাকাতুয়া, শুক ও কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষী পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পশুপক্ষীদিগের মনের ভাব পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। লরেঞ্জো সাহেব প্রথমে যখন তাহাদিগকে একত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাহারা অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করিত, এবং বিরক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদও করিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাহারা হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত এমন বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখন কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। কুক্কুর ও পক্ষিজাতির মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু

লরেঞ্জো সাহেবের কুক্কুর ও কুক্কুটের মধ্যে এমন বন্ধুতা জন্মিয়াছিল যে, যখন কুক্কুট কুক্কুরের কোমল ও দীর্ঘরোমরাজিতে আবৃত পৃষ্ঠে আসিয়া বসিত, তখন কুক্কুর অণুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিত
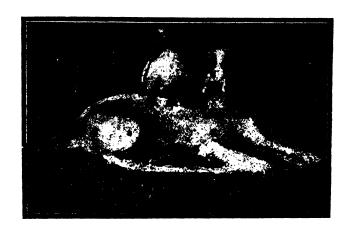
না। ঐরূপে বিড়ালগুলি যখন স্বীয় শাবকগণকে নিকটে রাখিয়া মুদ্রিতনয়নে বিশ্রাম লাভ করিত, তখন কুক্কুট বিশ্রামার্থ তাহাদের পৃষ্ঠে আসিয়া বসিলে বা ক্রোড়ে শয়ন করিলে, তাহারাও একটু বিরক্ত হইত না, বরং নানা ভাবভঙ্গী দ্বারা আনন্দের ভাবই প্রকাশ করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিবি হামণ্ড্ নামক এক ইংরাজ-মহিলা কুক্কুর ও শশকের অদ্ভুত বন্ধুতার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রচার

করিয়াছিলেন। ঘটনাটি স্পেনের জেন্ নামক এক ক্ষুদ্র নগরে সংঘটিত হইয়াছিল। বিবি হামণ্ড্ স্পেনভ্রমণকালে কতিপয় ইংরাজ-পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোন পরিবারের বালকবালিকাগণ কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি পালন করিত। এক দিবস প্রাতে সেই গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিবি হামণ্ড্ বালকবালিকাদের আনন্দ-কোলাহল শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, কয়েকটি শশকশাবক লাভ করিয়া বালকবালিকাগণ আনন্দধ্বনি করিতেছে। শাবকগুলি তখন নিতান্ত শিশু, স্বচেষ্টায় দুগ্ধপান করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত উহাদের ছিল না। বালকবালিকাগণ দুগ্ধসিক্ত বস্ত্রখণ্ড শাবকগুলির মুখে ধরিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করাইল, কিন্তু রাত্রিকালে উহাদিগকে কোথায় আশ্রয় দেওয়া হইবে, ইহাই সকলের ভাবনার বিষয় হইল। শেষে স্থির হইল, গৃহে যে পালিত মার্জ্জারটি পাকশালার কোণে নিদ্রা যায়, শাবকগুলিকে তাহার নিকট রাখা হইবে। গৃহস্বামী ও তাহার পত্নী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে মার্জ্জারটি শশক-শাবকদিগের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য সতর্ক রহিলেন। শাবকগুলিকে মার্জ্জারের উষ্ণ ক্রোড়ে রাখা হইল, মার্জ্জার একটুও বিরক্তি. প্রকাশ করিল না, বরং তাহাদিগকে পাইয়া পরমানন্দে তাহাদের গাত্রলেহন করিয়া স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় হইতে শশকগণ বিড়ালের সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিত ও একই পাত্রে আহার

করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শশকগণ যখন বিড়ালকে নানা-প্রকারে বিরক্ত করিত, তখনও তাহার ধৈর্য্যচ্যুতির কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইত না।

অষ্ট্রেলিয়াবাসী জনৈক ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্ব্বে বিড়াল ও হংসের অদ্ভুত বন্ধুতার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা স্বগৃহে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হংসের অপত্যস্নেহ প্রবল নয়। শাবক ডিম্ব হইতে নির্গত হইলে, হংসী তাহার আর সন্ধান লয় না। এ অবস্থায় গৃহস্থই শাবকগুলিকে আহারাদি দিয়া পালন করেন। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের গৃহে কয়েকটি হংসশাবক জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে একটী বাক্সে আবদ্ধ রাখি-তেন এবং স্বহস্তে আহার দিতেন। গৃহের পালিত বিড়াল নীরবে গৃহস্বামীর এই কার্য্য দেখিত। ইহার পর একদিন প্রত্যূষে মার্জ্জারকে হংসশাবকদিগের বাক্সে শায়িত দেখিয়া গৃহস্বামী বিস্মিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, হংসশাবকগুলি উদরস্থ করিয়া দুরন্ত বিড়াল নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু তিনি শেষে দেখিতে পাইলেন, সে শাবকগুলির একটুও অনিষ্ট করে নাই। তাহারা অক্ষত দেহে বিড়ালের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই সময় হইতে বিড়াল হংসশাবকগুলিকে সন্তানবৎ দেখিত ; অনবধানতাবশতঃ কোন দিন সেগুলি বাক্স হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলে, সে তাহাদিগকে সাবধানে মুখে করিয়া বাক্সে উঠাইয়া রাখিত।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে নেব্রাস্কা-নামক স্থানের জনৈক

গো-পালক ইতরপ্রাণীর বন্ধুতাসম্বন্ধে যে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা আরও অদ্ভুত। বহু গাভীর মধ্যে একটি দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কয়েক দিন অকারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত গো-পালক অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন যে, গাভীটি তাঁহারই এক শূকরশাবককে স্তন্যদান করে।

মাতৃহীন মেষশাবককে স্তন্যদানে পালন করার জন্য আমেরিকার কলেরেডো অঞ্চলের এক গর্দ্দভও এই প্রকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনয়ন করা এই গর্দ্দভের কার্য্য ছিল। ভার বহন করিয়া দিনান্তে প্রভুর গৃহে

উপস্থিত হইয়াই সে তাহার প্রিয় মেষশাবকের অনুসন্ধান করিত; এবং মেষশাবক স্তন্য পান করিয়া তৃপ্ত হইলে, অবশিষ্ট দুগ্ধ তাহার নিজ শাবককে দান করিত।

চেল্‌সি হইতে উইলিয়ম-নামক জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার গৃহপালিত একটি কুক্কুর ও কপোতের মধ্যে যে বন্ধুতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাও অল্প বিস্ময়কর নয়। কপোত ও কুক্কুর পৃথকস্থানে রক্ষিত হইত; কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাদের মধ্যে এমন বন্ধুতা হইয়া পড়িয়াছিল যে, কপোতকে পিঞ্জরমুক্ত করিলেই সে কুক্কুরের সন্ধানে চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইত এবং কুক্কুরও কপোতের আগমন অপেক্ষা করিয়া উপবিষ্ট থাকিত।

তৎপরে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলেই কুক্কুর কপোতকে পৃষ্ঠে লইয়া আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইত। কপোতও ইহাতে যেন পরম আনন্দ উপভোগ করিত।

প্রভুভক্ত ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ঘোটকের চিরকাল প্রসিদ্ধি আছে। ঘোর সঙ্কটে কেবল সুশিক্ষিত অশ্বের চাতুর্য্যে শত শত ব্যক্তি বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অশ্ব যে দুর্ব্বলতর অপর কোন প্রাণীর সহিত বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। আমেরিকার ব্রুক্মিউ-নামক প্রদেশের একটি অশ্ব বস্তুতই এই প্রকার বন্ধুতার পরিচয় দিয়াছে। এক বিড়ালের সহিত তাহার এ প্রকার বন্ধুতা হইয়াছিল যে, উভয়ে সর্ব্বদা একস্থানে থাকিতে ভালবাসিত। অশ্বশালাই বিড়ালটির বিচরণ-ক্ষেত্র ও বিশ্রামস্থান হইয়াছিল। মার্জ্জার ও অশ্ব উভয়েই অশ্বশালার তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিত এবং নিদ্রাকালে যাহাতে মার্জ্জার কোন প্রকারে আহত না হয়, তজ্জন্য ঘোটক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। অশ্ব ও মার্জ্জারের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বন্ধুতার পরিচয় পাইয়া গৃহস্বামী উভয়কেই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে দিতেন। শেষে এই প্রাণিদ্বয় সাধারণের দর্শনীয় হইয়াছিল।

———

বায়ু।

আমরা বায়ু দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সকল সময়েই উপলব্ধি করিতে পারি। প্রবল ঝটিকার সময় যখন বৃহৎ মহীরুহগণ উন্মূলিত হইতে থাকে, তখন তাহার বিক্রম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। নিদাঘের অপরাহ্লে প্রকৃতি যখন অবসন্ন ও স্তব্ধ হয় এবং বৃক্ষচূড়ার পত্রাবলীও যখন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে, তখনও সহসা দক্ষিণাগত বায়ুর শীতল স্পর্শ নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। কাচ ও অগভীর জল উভয়ই স্বচ্ছ, এজন্য কোন পাত্রে অল্প জল রাখিলে বা সম্মুখে একখণ্ড পরিষ্কার কাচ ধরিলে, চক্ষুর সাহায্যে সহসা জল বা কাচ কোনটিরই অস্তিত্ব জানা যায় না। কাচ ও জল অপেক্ষা বায়ু আরও স্বচ্ছ, এজন্য দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব।

জল ও শর্করা উভয়ই প্রায় স্বচ্ছ বস্তু। ইহাদের মিশ্রণে জলের স্বচ্ছতার হানি হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সরবতে যেমন শর্করা ও জল বর্ত্তমান থাকে, বায়ুতে সেই প্রকার অম্লজান অর্থাৎ অক্সিজেন এবং যবক্ষারজান অর্থাৎ নাইট্রোজেন নামক দুইটি স্বচ্ছ বায়বীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। সরবতে শর্করা ও জল উভয়েরই গুণ অব্যাহত থাকে। জল তাহার শৈত্য ও তারল্য প্রভৃতি ধর্ম্ম হারায় না এবং

শর্করাও তাহার স্বাদুতা ত্যাগ করে না। অম্লজান ও যবক্ষার-জান নামক যে দুই বাষ্পের মিশ্রণে বায়ুর উৎপত্তি, তাহারাও মিশ্রিত অবস্থায় নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।

ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য কিছুদিন যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার না করিলে সেগুলিতে স্থানে স্থানে গৈরিক বর্ণের মরিচা সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। লৌহময় দ্রব্য আর্দ্র স্থানে রাখিলে এই মরিচার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং পরিশেষে ঐ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ুর অম্লজানই এই মরিচার উৎপত্তি করে। দুইটি পৃথক্ বাষ্পের যোগে যে, বায়ুর উৎপত্তি হয়, প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন না। বায়ুস্পর্শে কতকগুলি ধাতুতে যে মরিচার উৎপত্তি হয়, তাহা দেখিয়াই ক্রমে তাঁহারা ইহা নির্ণয় করেন। একটি কাচপাত্রে কয়েক খণ্ড লৌহ রাখিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, লৌহে মরিচা ধরিয়াছে এবং পাত্রস্থিত বায়ুর পরিমাণের হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বায়ুর যে অংশ মরিচার উৎপত্তিকার্য্যে ব্যয়িত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকেই "অম্লজান" নামে অভিহিত করেন। এবং মরিচা ধরার পরও পাত্রে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে "যবক্ষারজান" সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা পাঁচ ভাগ বায়ুর মধ্যে এক ভাগ অম্লজান এবং অবশিষ্ট চারিভাগ যবক্ষারজান পাওয়া গিয়াছে।

কেবল মরিচার উৎপত্তি করাই অম্লজানের কার্য্য নয়, দহন-

কার্য্যের ইহাই প্রধান সহায়। উজ্জ্বল দীপশিখা যখন আলোক বিতরণ করিতে থাকে, তখন বায়ুর অম্লজানই তৈলের নানা উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাপের উৎপত্তি করে; এবং এই তাপই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখে। কেবল দীপশিখায় নহে, যেখানে অগ্নি, সেইখানেই বায়ুর অম্লজান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দহনকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। সুতরাং যেখানে বায়ু নাই, সেখানে দহনও নাই, এই জন্যই বায়ুহীন স্থানে কোন পদার্থকে দগ্ধ করা যায় না। উজ্জ্বল দীপশিখা কোন পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিলে পাত্রের আবদ্ধ বায়ুতে যে অম্লজান থাকে তাহার ক্ষয় হইয়া গেলে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

যবক্ষারজান-নামক বায়ুর অপর উপাদানটির কার্য্য স্বতন্ত্র। যখন অগ্নি অত্যন্ত প্রবলভাবে জ্বলিতে আরম্ভ করে, তখন উহাতে ধূলি বা ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া আমরা তাহা নির্ব্বাপিত করি। ধূলি বা ভস্ম কোনটিই দাহ্য পদার্থ নহে, সেই জন্য এগুলি অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া তাহার তেজ নষ্ট করে। বায়ুর যবক্ষারজান উদাহৃত ধূলি বা ভস্মের ন্যায়ই অগ্নির তেজঃ প্রশমিত করে। বায়ুতে যদি কেবলই অম্লজান থাকিত তাহা হইলে দহনকার্য্য এত শীঘ্র সম্পন্ন হইত যে, আমরা কোন কার্য্যে অগ্নির ব্যবহার করিতে পারিতাম না।

শ্বাসের সহিত আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি তাহাও প্রকারান্তরে ধীরে ধীরে দেহে আর একপ্রকার দহনকার্য্যেরই সূচনা করে। ইহা দেহপ্রবিষ্ট হইয়া যখন দেহেরই নানা

পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন এই দহনের সূত্রপাত হয়। ইহাতে অগ্নি উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু যথেষ্ট তাপ জন্মে। প্রাণিদেহে সর্ব্বদাই যে তাপ বিদ্যমান, তাহা এই প্রকার ধীর দহনেরই তাপ। বায়ুতে যবক্ষারজান না থাকিলে শরীরের তাপ এত অধিক হইত যে, আমরা জীবনধারণ করিতে পারিতাম না।

কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। অদ্য ঝটিকায় যে বৃক্ষটি উন্মূলিত হইয়া ভূশায়ী হইল, উহাকে তদবস্থায় দীর্ঘকাল রাখিলে সম্ভবতঃ তথায় উহার কোন অংশেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ইহা দেখিয়াই বৃক্ষের সকল অংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই ভুল হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বৃক্ষের একটি অণুরও ধ্বংস হয় না। উহার জলীয় অংশ সূর্য্যের তাপে বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধোত্থিত হয় এবং কঠিন অংশ নানা আকার গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে। কেবল বৃক্ষ নয়, চেতন, অচেতন সকল বস্তুই এই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। যখন কোন বস্তুকে আমরা অন্তর্হিত হইতে দেখি, তখন বুঝিয়া লইতে হয় যে, তাহার কোন অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

দাহ্য পদার্থের সহিত বায়ুর অম্লজান মিশ্রিত হইয়া যখন অগ্নি বা তাপের উৎপত্তি করে তখন ইহারও ধ্বংস হয় না। বায়ুর অম্লজান দাহ্য পদার্থের অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া অঙ্গারকবাষ্পের উৎপত্তি করে। অঙ্গারকবাষ্প স্বাস্থ্যরক্ষার

অনুকূল নহে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে ইহা বিষবৎ কার্য্য করে এবং অধিক বাষ্প দেহস্থ হইলে, প্রাণিমাত্রেই হতচেতন হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শত শত বৎসর ধরিয়া প্রতিদিনই কলকারখানায় ও গ্রামনগরে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকায় বায়ুর অম্লজান বিকৃত হইয়া যে রাশি রাশি অঙ্গারকবাষ্প উৎপন্ন করিতেছে, তাহা কি বায়ুরাশিকে অস্বাস্থ্যকর করিতেছে না? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উত্তরে যাহা বলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। ইঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অগ্নি-প্রজ্বলনে এবং কোটি কোটি প্রাণীর নিঃশ্বাসে নিয়তই যে অঙ্গারক-বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হইতে পারে না। ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল উদ্ভিদ্ই বায়ু হইতে এই বিষাক্ত বাষ্প শোষণ করিয়া লয়, এবং কিয়ৎকাল পরে তাহাই আবার বিশুদ্ধ অম্লজানে রূপান্তরিত করিয়া বায়ুতে প্রত্যর্পণ করে। এই ব্যবস্থায় কোন প্রকারে কদাপি বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্পের আধিক্য দেখা যায় না। শত বৎসর পূর্ব্বে বায়ু যেমন নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল, লক্ষ লক্ষ কল কারখানার চুল্লীতে অবিরাম অগ্নি প্রজ্বলিত থাকা সত্ত্বেও এখন তাহা সেই প্রকারই নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর আছে।

বায়ুর অম্লজানের অঙ্গারকবাষ্পে পরিণতি এবং সেই অঙ্গারকবাষ্প হইতে উদ্ভিদের সাহায্যে আবার অম্লজানের পুনরাবির্ভাব, যুগ যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই আজ

জগৎ এত সুন্দর। ইহা যেন বিশ্বশিল্পীর কর্ম্মশালাস্থ চক্রের আবর্ত্তন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এইরূপে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরমেশ্বর কত সহজে সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়।

শ্বাসের সহিত দেহস্থ হইয়া বায়ু কি প্রকারে প্রাণীদিগের জীবনধারণের সহায় হয়, এবং উদ্ভিদ্‌সমূহ বায়ুর অঙ্গারকবাষ্প গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে জীবিত থাকে ও বায়ু বিশুদ্ধ রাখে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লৌহ প্রভৃতিতে মরিচা উৎপন্ন করিয়া ও নানা দাহ্য পদার্থের দহনে সাহায্য করিয়া বায়ু কি প্রকারে ক্ষয়কার্য্যের সহায় হয়, তাহারও আভাস পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভূখণ্ড ব্যাপিয়া বায়ুর যে আর একটি কার্য্য নিয়তই ভূভাগের রূপান্তর সাধন করিতেছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

সূর্য্যের তাপে ও বৃষ্টির জলে পার্ব্বত্য প্রদেশে শিলা নিয়-তই চূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে। এই নূতন মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া তাহা সেই স্থানে অবস্থান করিলে তদ্দ্বারা আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয় না, বরং অপকারই হয়, কারণ নিম্নস্তরের শিলা পূর্ব্ব মৃত্তিকারাশিতেই আবৃত থাকিয়া আর নূতন মৃত্তিকা উৎ-পাদন করিতে পারে না। বৃষ্টির জল চূর্ণীকৃত শিলা বহন করিয়া নিম্ন স্থানকে উচ্চ করে, এবং বৃষ্টির অনুপস্থিতিতে বায়ুই প্রবল-ভাবে প্রবাহিত হইয়া, তাহা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়।

বায়ুপ্রবাহের এই কার্য্য ভূপৃষ্ঠের যে কত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা যে জীবজগতের কত উপকার হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ভারতের ঋতুপর্য্যায়।

ঋতুবৈচিত্র্যের জন্য চিরদিন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত প্রত্যেক ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অভিনব রূপ গ্রহণ করিয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়। গ্রীষ্মে যখন তাপদগ্ধা বসুন্ধরা বারিধারা প্রার্থনা করে, এবং রুদ্রমূর্ত্তি বৈশাখঝটিকা ধূলিধ্বজা উড়াইয়া ও মেঘগর্জ্জনচ্ছলে শঙ্খনাদ করিয়া সলিল বর্ষণ করে, তখন প্রকৃতির এক নূতন মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। ইহার পরে, ধরিত্রী যখন নব আষাঢ়ের স্নিগ্ধ জলধারায় সুস্নাত হইয়া শ্যামলদূর্ব্বাদলবসনে দেহ আবৃত করে, তখন প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। তাহার কিছুদিন পরে, শেফালী প্রভৃতির গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠে, এবং দিগন্তবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র ক্রমে সুবর্ণবর্ণে শোভিত হইয়া ধরণীতে শরৎ ও হেমন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। তৎপরে আবার কৃষকগণের নবশস্যলাভের আনন্দধ্বনি-মধ্যে যখন শিশিরের অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে, এবং বসন্তের দক্ষিণ-বায়ুস্পর্শে যখন বৃক্ষলতাগুল্ম নব পুষ্পপত্রে পুলক প্রকাশ করিতে থাকে, তখন প্রকৃতিদেবীর অপর এক কান্তি দৃষ্টি-গোচর হয়।

এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, যে সকল সাগর-মহাসাগর দেশ বেষ্টন করিয়া আছে, এবং যে সকল নদীগিরি ও সুবিস্তীর্ণ উচ্চনিম্ন-ভূমি

ভারতের বৈচিত্র্যবিধান করিতেছে, তাহাদের অবস্থানাদির আলোচনা, এবং বায়ুপ্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশি সবেগে আগমন করিয়া তাহা প্রবলতর করে। গৃহদাহের সময়ে এই প্রকার বায়ুপ্রবাহ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। হয়ত অন্যত্র প্রকৃতি নির্ব্বাত, কিন্তু যে গৃহখানি দগ্ধ হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুরাশি ঝটিকাবেগে তথায় ধাবিত হইয়া অগ্নি উত্তেজিত করিয়া তুলে। পণ্ডিতগণ বলেন, অগ্নির তাপে বায়ু প্রসারিত হইয়া লঘুতর হয়, এবং তদ্রূপ হইলে, তাহা আর পার্শ্বের ঘনবায়ুর ভিতরে অবস্থান করিতে পারে না। জলের তুলনায় কাষ্ঠ লঘু, এজন্য কাষ্ঠ জলমগ্ন করিতে গেলে, তাহা যেমন ভাসিয়া উঠে, অগ্নির সংস্পর্শে যে বায়ুরাশি স্ফীত হইয়াছে, তাহাও অবিকল সেই প্রকারে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন স্থান স্বভাবতঃ বায়ুশূন্য থাকিতে পারে না; সুতরাং অগ্নির উপরিস্থিত বায়ু লঘুতর হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেই পার্শ্বের বায়ু দ্রুতবেগে আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করে। কেরোসিনের দীপের চারিদিকে যে কাচের আবরণ থাকে, তাহার উপরে কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা ছাড়িয়া দিলে, সেগুলিকে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে দেখা যায়। ইহাও লঘু বায়ুর ঊর্দ্ধগমনের অপর উদাহরণ। অগ্নি-শিখার তাপে আবরণের উপরিস্থিত বায়ু স্ফীত ও লঘু হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা পূর্ব্ব স্থানে স্থির না থাকিয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলিকেও উড়াইয়া

লইয়া যায়। বায়ুপ্রবাহমাত্রেরই উৎপত্তির মূলে লঘু বায়ুর ঊর্দ্ধগমন এবং তথায় পার্শ্বস্থ বায়ুর সবেগে আগমন, এই দুই ব্যাপার বর্ত্তমান থাকে। বৈশাখের অপরাহ্নে যখন মহাঝটিকার তাণ্ডবনৃত্য আরব্ধ হয়, এবং শতক্রোশব্যাপী ঘূর্ণিবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে ধনজন পূর্ণ বহু অর্ণবপোত ও নগরের ধ্বংসসাধন করে, তখনও বুঝিতে হয়, পৃথিবীর কোন অংশের বায়ুরাশি নিশ্চয়ই কোন কারণে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং সেই কারণে অন্য স্থান হইতে বায়ু তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য সবেগে আগমন করিতেছে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি কয়েক মাস ব্যাপিয়া দক্ষিণ বা দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে যে স্বাস্থ্যপ্রদ সুখস্পর্শ বায়ু অবিরাম মৃদুবেগে প্রবাহিত হয় এবং পরে উত্তর দিক্ হইতে যে মৃদু বায়ুপ্রবাহ আসিয়া শীত ঋতুর সূচনা করে, তাহা দেখিলেও বুঝিতে হয়, দেশের বা দেশসন্নিহিত কোন স্থানের বায়ুরাশি অবিরাম লঘু হইয়া উপরে উঠিতেছে, এবং এই কারণে শূন্য স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত পার্শ্বের বায়ু দ্রুতবেগে আগমন করিয়া প্রবাহের উৎপত্তি করিতেছে।

বায়ুপ্রবাহের সহিত দেশের বৃষ্টিপাতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্য বারিপাতেরই উপরে নির্ভর করে। দক্ষিণ বায়ুই সমুদ্র হইতে জলীয়বাষ্প বহন করিয়া ভারতে প্রবিষ্ট হয়। তাহার পরে, স্থানীয় শীতলবায়ুযোগে বা উচ্চপর্ব্বতের শীতল স্পর্শে সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘই বৃষ্টিধারায় পরিণত হয়। সুতরাং সজল সমুদ্রবায়ুর

প্রবাহকেই বর্ষার সৌন্দর্য্যের মূলকারণ বলা যাইতে পারে। ইহার পর, এই বায়ুপ্রবাহের পরিবর্ত্তন হইলে যখন আকাশ মেঘনির্ম্মুক্ত, এবং বর্ষার বারিধারাপুষ্ট বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে পরিশোভিত হয়, তখন শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। শীত ঋতুর শোভাও উত্তরাগত শীতল বায়ুপ্রবাহের উপরে নির্ভর করে। এই প্রবাহ প্রায় জলীয়বাষ্পবর্জ্জিত। এই কারণে, শীতের আকাশ নির্ম্মল থাকে এবং প্রচুর শিশিরপাত হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ্ এই শিশিরেই পুষ্ট ও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়, এবং কতকগুলি আবার শীতল বায়ুর স্পর্শে শ্রীভ্রষ্ট ও স্তব্ধ হইয়া বসন্তের ঈষদুষ্ণ বায়ুপ্রবাহের প্রতীক্ষায় কালযাপন করে। ফাল্গুনে দিনগুলি দীর্ঘতর হইলে, এবং দক্ষিণ বায়ুর প্রবাহ আরব্ধ হইলে, এই সকল মৃতবৎ বৃক্ষলতায় নূতন জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়, তখন উহারা পুরাতন পত্রাবলী জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া নূতন শ্যামলবসনে দেহ আবৃত করে, এবং নবপুষ্পপত্রে বসন্তশ্রীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৎসরের নানা সময়ে যে সকল বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহারাই ভারতের ঋতুপরিবর্ত্তনের মূল কারণ।

বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন ভূমির উপস্থিত বায়ু কি প্রকারে লঘু হইয়া জলীয়বাষ্পপূর্ণ সামুদ্রিক বায়ু ও শুষ্ক উত্তরবায়ুর উৎপত্তি করে, তাহা আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীতে আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদের

সকলের গুণ সমান নয়। মৃৎপিণ্ড এবং লৌহগোলক উভয়ই কঠিন পদার্থ; কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য উহাদিগকে রৌদ্রে রাখিলে দেখা যায়, লৌহগোলক মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা উষ্ণতর হইয়াছে। একই তাপে নানা পদার্থের উষ্ণতার এই তারতম্য কেবল লৌহ ও মৃত্তিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বালুকাময় নদী-তীর ও তৃণাবৃত ভূমিখণ্ড যে সৌরতাপে সমান উষ্ণ হয় না, তাহা আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই। জল ও মৃত্তিকা লইয়া পরীক্ষা করিলেও এই অসম উষ্ণতার লক্ষণ আরও পরিস্ফুট হয়। জলের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহা সহজে উষ্ণ হয় না, এবং একবার উষ্ণ হইলে শীঘ্র তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল হয় না। কিন্তু শিলা ও মৃত্তিকার ধর্ম্ম সেরূপ নয়। এগুলি অল্প তাপেই যথেষ্ট উষ্ণ হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল হইয়া যায়। এই কারণেই বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপে পূর্ব্বাহ্নে যখন জলাশয়ের বারিরাশি শীতল থাকে, তখন স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া উঠে। আবার সন্ধ্যার আগমনে যখন স্থলভাগ শীঘ্র তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল হয়, তখন জলাশয়ের জলে উষ্ণতা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ জল ও স্থলভাগের উষ্ণতার এই বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাসাগর অবস্থান করিতেছে। এই জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের দীর্ঘ ও উষ্ণ দিবসে ভারতের স্থলভাগ যখন সমুদ্রের তুলনায় অধিকতর উত্তপ্ত হয়, তখন ভূসংলগ্ন বায়ুরাশিও

উষ্ণ ও লঘু হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই অবস্থায় দক্ষিণ বা দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে সমুদ্রের বায়ু শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য ধাবমান হয়। ইহাই জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ বায়ু। জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিনের কিয়দ্দিন-পর্য্যন্ত ইহা ভারতে সঞ্চারণ করে, এবং উচ্চপর্ব্বতে প্রতিহত হইলেই, ইহার সহিত যে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তাহা ঘনীভূত হইয়া ভারতে বর্ষার সূচনা করে।

ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণভারতের করাচি হইতে নর্ম্মদানদীপর্য্যন্ত ভূভাগে উচ্চ পর্ব্বত নাই। এই জন্য রাজপুতনার বালুকাময় ভূমি ও সিন্ধু প্রদেশের উপর দিয়া জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ বারিবর্ষণ না করিয়া অবাধে চলিয়া যায়, এবং পরে পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের সীমান্তে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রচুর বারিপাত আরম্ভ করে।

দক্ষিণভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র। পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীতে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণ বায়ু মালবদেশে বর্ষণ আরম্ভ করে। এই স্থানে বৎসরে প্রায় একশত কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়, অর্থাৎ বৎসরে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা স্থানান্তরে অপসৃত বা শুষ্ক হইয়া না গেলে, সম্মিলিত জলের গভীরতা প্রায় সাত হাত হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই বারি-পরিমাণ বড় অল্প নয়।

বঙ্গদেশ ও আসামে যে বাষ্পে বারিপাত হয়, তাহা বঙ্গোপ-

সাগর হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া খাসিয়া পর্ব্বতে প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে চিরাপুঞ্জী-অঞ্চলে মুষলধারে অবিরাম বৃষ্টি হইতে থাকে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই স্থানে বৎসরে যে বৃষ্টি হয়, তাহা সঞ্চিত হইলে, স্থানটিকে প্রায় চল্লিশ হাত গভীর জলে নিমগ্ন রাখিতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এই স্থানের বারিপাতের পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাহা হউক, এই বায়ুই যখন হিমালয়ে বাধা পাইয়া পশ্চিমোত্তরমুখে চলিতে আরম্ভ করে, তখন তদ্দ্বারা বঙ্গদেশে বারিবর্ষণের আরম্ভ হয়। এই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কখনই উত্তরে যাইতে পারে না। হিমালয়ের অপরপার্শ্বস্থ তিব্বতাদি প্রদেশ এই কারণেই বৃষ্টির অভাবে মরুভূমিপ্রায় হইয়াছে।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে যখন দিনমান রাত্রিমানের তুলনায় ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে, তখন ভারতের স্থলভাগ সুদীর্ঘ রজনীতে তাপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রজল অপেক্ষা শীতলতর হইয়া পড়ে। এই কারণে সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ুরাশি উষ্ণ ও লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকিলে, ভারতবর্ষের উপর দিয়া এক বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিস্থিত শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য ধাবমান হয়। ইহাই উত্তর বা পূর্ব্বোত্তর বায়ুপ্রবাহ। ভারতের উত্তরে সমুদ্র নাই। সুতরাং এই বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে না, এবং ইহার সঞ্চরণে বারিপাতও হয় না। কেবল বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া ইহার যে অংশটি ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণ-উপকূলবর্ত্তী

শৈলমালায় আহত হয়, তাহাই সমুদ্রের জলীয়বাষ্প আনয়ন করিয়া করমণ্ডল প্রদেশে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করে।

বৃষ্টির বারিধারা কেবল ঋতুর বৈচিত্র্যবিধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় না, ইহা ভূপৃষ্ঠেরও নানা বৈচিত্র্যবিধান করে। তদ্ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের নানা আবর্জ্জনা এবং বায়ুমণ্ডলে প্লবমান ধূলিকণা ও ধূমাদি ধৌত করিয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণ করাও ইহার আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য। প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে ধূলিকণা আকাশে উত্থিত হয়, এবং শত শত কলকারখানার চুল্লী হইতে যে ধূমরাশি নিয়তই বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হয়, তাহা কখনই জীবের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। প্রাণিগণ দীর্ঘকাল এই কলুষিত বায়ু গ্রহণ করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ে। পত্রাবলীতে যে ধূলিস্তর সঞ্চিত হয়, তাহা উদ্ভিদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করে। যখন বৃষ্টির জল ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করে, তখন, এই সকল আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন বায়ুমণ্ডল ধূলিপূর্ণ, এবং তরুলতা ধূলিধূসরিত হইয়া অবস্থান করে, তখন বৃষ্টির অব্যবহিত পরে আকাশ যে কেমন নির্ম্মল, এবং উদ্ভিদ্‌গুলি যে কি প্রকার শ্রীসম্পন্ন হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

পর্ব্বতে বা উচ্চভূমিতে যে বর্ষণ হয়, তাহার জল একত্র হইয়া যখন নিম্নভূমিতে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা নির্ম্মল থাকে না। উচ্চ স্থানের নানা আবর্জ্জনা ও মৃত্তিকাদি ধৌত করিয়া ইহা নিম্নে গমন করিতে থাকে। তৎপরে, এই জলরাশি নদীর সহিত মিলিত হইলে, তাহার কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা নদীপ্রবাহের

সহিত দূরদূরান্তরে চালিত হয়। সমুদ্র ও নদীর সঙ্গমস্থলে যে সকল ব-দ্বীপের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা নদীপ্রবাহ-বাহিত মৃত্তিকাদি দ্বারাই গঠিত। খরস্রোতে পতিত হইয়া কর্দ্দমরাশি নদীগর্ব্ভে সঞ্চিত হইতে পারে না। বন্যার সময় নদীর যে জল উভয় কূল প্লাবিত করিয়া স্রোতোহীন হয়, কেবল তাহারই কর্দ্দম নদীতীরবর্ত্তী ভূভাগে সঞ্চিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। সমুদ্রে নদীর ন্যায় স্রোত নাই। এজন্য নদী যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তখন মিলনস্থলে তাহা স্রোতোহীন হইয়া পড়ে, ইহাতে জলের সমুদয় কর্দ্দমই সঙ্গমসন্নিহিত-স্থানে সঞ্চিত হইয়া নূতন স্থলভাগের উৎপত্তি আরম্ভ করে। আমাদের দেশের সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং আফ্রিকার নীল প্রভৃতি নদনদী উচ্চ স্থানের ক্ষয় এবং নিম্ন স্থানের পূরণ করিয়া ভূভাগের যে বৈচিত্র্যবিধান করিতেছে, তাহা দেখিলে বৃষ্টির জল ও নদীর কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়েরই ফল অতি ভয়ঙ্কর। ভারতসাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে বৎসরে কি পরিমাণ বারিপাত হয়, বায়ুর উষ্ণতা কত ও তাহাতে কি পরিমাণ জলীয়বাষ্প মিশ্রিত আছে, তাহা রাজব্যয়ে নির্ণীত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভারতের প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র নগরে বারিপাতাদি পরিমিত হইতেছে। বায়ুপ্রবাহের পরিবর্ত্তন ও বৃষ্টির তারতম্য দীর্ঘকাল লিপিবদ্ধ থাকায় বৃষ্টিবাত্যাদিসম্বন্ধে

যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেশের অশেষ উপকার হইতেছে। কোন্ প্রদেশে শীঘ্র বারিপাত হইবার সম্ভাবনা আছে, প্রতি সপ্তাহেই সরকারী গেজেটে তাহার পূর্ব্বাভাস প্রচারিত হয়। ইহা জানিয়া কৃষক ও ব্যবসায়িগণ ভবিষ্যতের লাভালাভ বিচার করিয়া সতর্ক হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত আবহবিভাগের সুপণ্ডিত কর্ম্মচারীগণ ঝটিকা বা প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর আগমনসম্ভাবনা জানিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশে যে ঘোষণালিপি প্রচার করেন, তাহাও দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। যখন আসন্ন ঝটিকার সংবাদ অবগত হইবার উপায় ছিল না, তখন প্রতিবৎসরই যাত্রিপূর্ণ বহু অর্ণবপোত ও নৌকা অকস্মাৎ ঝটিকাক্রান্ত হইয়া প্রায়ই জলমগ্ন হইত। এক্ষণে ঝটিকার আগমনসম্ভাবনা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া পোতাধ্যক্ষগণ সাবধান থাকেন। বঙ্গের আলিপুরে, বোম্বাইয়ের কোলাবানামক স্থানে, মান্দ্রাজের কোদাইকানাল নগরে এবং কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে কয়েকটি পার্ব্বত্য স্থানে রাজব্যয়ে বৃষ্টিবাত্যা-পরিমাণের জন্য যে সকল পর্য্যবেক্ষণাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যাবলীতেও জনসাধারণের পরম উপকার হইতেছে।

গৌড়ের কীর্ত্তিচিহ্ন।

আধুনিক মালদহের নিকটবর্ত্তী গৌড়ে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের ত্রিধারার যে অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখা যায়, ভারতের অতি অল্পস্থানেই তাহা দৃষ্ট হয়। কোন্ সময়ে কোন্ রাজা গৌড়ে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন, ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ দেখিয়া অনেকে মনে করেন ইহাই সেই প্রাচীন নগর। ইহা তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল নরপতিগণের রাজধানী ছিল। ইঁহাদের রাজ্যই কালক্রমে সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত এবং তৎপরে মুসলমান নরপতিদিগের করতলগত হয়। সুতরাং গৌড়, বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান এই ত্রিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণের রাজলক্ষ্মীর লীলাভূমি। তৃণগুল্মাচ্ছাদিত যে রাজবর্ত্ম এখন শ্বাপদকুলের বিচরণপথ হইয়াছে, তদ্দারা এককালে বহু

হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ নরপতি বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইতেন। গৌড়ের ভগ্ন তোরণ, সমাধিমন্দির, ভজনালয় প্রভৃতি হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ স্থাপত্যচিহ্ন ধারণ করিয়া অদ্যাপি পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।
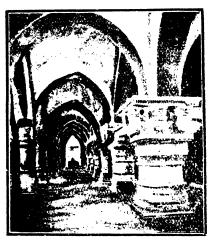
যাঁহারা কীর্ত্তিচিহ্ন পরিদর্শন করিতে গৌড় অঞ্চলে গমন করেন, প্রথমেই আদিনা মস্‌জিদ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এত বৃহৎ এবং এত সুন্দর মস্‌জিদ ভারতে অতি অল্পই দেখা যায়। প্রসিদ্ধ মুসলমান নরপতি সামসুদ্দিন ইলিয়াসের বংশধর সুলতান সেকেন্দর সাহেবের রাজত্বকালে এই কারুকার্য্যময় মস্‌জিদের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। চতুর্দ্দিকে বহুপ্রকোষ্ঠ এবং মধ্যে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ এখনও আদিনার পূর্ব্বতন গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বাহ্য সৌন্দর্য্যের তুলনায় ইহার

আভ্যন্তরিণ সৌন্দর্য্যই অধিক। অভ্যন্তরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে "বাদশাহ তখ্ত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় আট হাত উচ্চ একটি সুবিস্তৃত শিলাময় উপাসনামঞ্চ এই নামে খ্যাত। ইহারই পুরোভাগে কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত কারুকার্য্যময় যে এক প্রাচীর বর্ত্তমান, তাহার সৌন্দর্য্য আজও অতুলনীয় রহিয়াছে। আদিনার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তর অতুল কারুকার্য্যময়। বঙ্গে মুসলমান স্থপতিবিদ্যা যে কত উন্নত ছিল, আদিনা মস্‌জিদ দেখিলে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আদিনা মস্‌জিদের পরেই কয়েকটি অতি প্রসিদ্ধ ভগ্ন অট্টালিকা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের একটির নাম বারদুয়ারী।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিদ্যানুরাগী বাদসাহ হোসেন সাহের পুত্র সুলতান নসরিৎ সাহের রাজত্বকালে বারদুয়ারী নির্ম্মিত হয়। ইহা একটি জুমা-মস্‌জিদ। তাহার পূর্ব্বদিকে বৃহৎ প্রাঙ্গণ বর্ত্তমান। এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে যাহাতে সহস্র সহস্র উপাসক অনায়াসে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনটি তোরণ দণ্ডায়মান। স্বয়ং বাদসাহ এই মস্‌জিদেই প্রজামণ্ডলীর সহিত একত্র নমাজ করিতেন। ইহার সৌন্দর্য্য অপর অট্টালিকা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এই মস্‌জিদের সকল প্রকোষ্ঠেই যে সকল সুবিন্যস্ত খিলান আছে সেগুলি অতি সুন্দর। বারদুয়ারীর নির্ম্মাণে বাদসাহের প্রচুর ব্যয় হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে সোণামস্‌জিদও বলিয়া থাকে।

সোণামস্‌জিদের নিকটেই দুর্গতোরণ "দখল-দরওজা" বিদ্যমান এবং তাহার পরেই অনতিদূরে "ফিরোজ-মিনার" অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে বার্ব্বকসাহ নামক বাদসাহ পূর্ব্বোক্ত দুর্গতোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফিরোজ-মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন না। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, সম্ভবতঃ উপাসকমণ্ডলীকে ভজনালয়ে আহ্বান করিবার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার ইহাকে "প্রহরি মন্দির" বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক, এই ৫৪ হাত দীর্ঘ মিনার যেরূপ বৃহৎ সেইরূপ পরম রমণীয়—এককালে যে একান্ত কারুকার্য্যময় গম্বুজ ইহার শোভা বর্দ্ধন করিত, এখন তাহা নাই এবং ইহার সোপানাবলীও এখন ভগ্নদশাপন্ন; তথাপি সৌন্দর্য্যে ইহা অনেক প্রাচীন অট্টালিকাকে পরাভব করিতেছে। কথিত আছে ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আবিসিনীয় বাদসাহ মালেক ইদ্দিল ফিরোজ-মিনার নির্ম্মাণ করেন। আশা পীর নামক জনৈক বিখ্যাত ফকীর ইহাতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। স্থানীয় নিরক্ষর কৃষকদিগের নিকট প্রাচ্য শিল্পের আদর্শস্থানীয় এই মিনারটি "চেরাক্‌দানী" নামে খ্যাত।

লোট্টন-মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ গৌড়ের আর একটি দর্শনীয় স্থান। বহু জনশ্রুতি এই প্রাচীন মস্‌জিদের সহিত জড়িত রহিয়াছে। কোন্ বাদসাহ কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে ইহার নির্ম্মাণ হয়, ঐতিহাসিকগণ তাহা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই।

মস্‌জিদটি দীর্ঘ সরোবরতীরে অবস্থিত। যে সকল ইষ্টক ও প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত তাহাদের বিচিত্র বর্ণ এবং সুন্দর বিন্যাস পরম মনোরম। উত্তরভারতে লোটুন-মস্‌জিদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভজনালয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মস্‌জিদের দক্ষিণে "কোতয়ালীদ্বার" নামে যে প্রহরিমন্দির আছে, তাহাও আর একটি দর্শনীয় বস্তু। ৮৬০ হিজরী শকে বাদশাহ মামুদ শাহের রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হয়। দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতি সুন্দর।
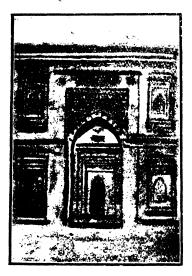
এতদ্ব্যতীত গৌড়ে নগরপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, "একলক্ষী", "রামকেলী" এবং "কদমরসুল" প্রভৃতি যে শত শত ভগ্ন অট্টালিকা আছে, সেইগুলিরও শিল্পনৈপুণ্য দর্শককে স্তম্ভিত করে। অতি

প্রাচীন কালে যখন গৌড় হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিদিগের অধিকারে ছিল, সে সময়ের যে দুই একটি কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে তাহাও চমৎকার।

"কদমরসুল" ইসলামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ আরব দেশের মদিনা হইতে ইহা রাজধানী গৌড়ে আনয়ন করেন। ইহারই পুত্র নসারৎ শাহ এক সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে "কদমরসুলের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন সেই মস্‌জিদই "কদমরসুল" নামে খ্যাত। কিন্তু ইহাতে আর "কদমরসুল" নাই। তাহা কোথায় কিরূপে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারেন নাই।

গৌড় হতশ্রী হইয়াছে সত্য, কিন্তু যতদিন তাহার শত শত মস্‌জিদের এক খণ্ড কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টক বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ইহার স্মৃতি বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইবে না। প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ বহু সুন্দর মস্‌জিদে বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া, সেইগুলিকে ক্রমেই ধরাশায়ী করিতেছিল; সদাশয় ইংরাজ বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া বহুব্যয়ে অনেক পতনোম্মুখ মস্‌জিদ ও মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া সেগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের জীর্ণসংস্কার করিয়া ইংরাজরাজ তাঁহার সহৃদয়তা এবং প্রজারঞ্জনবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

ইংরাজশাসনে ভারতবর্ষ।

গৃহ শান্তিময় এবং প্রতিবেশিবর্গ সৎ হইলে মানব শাকান্ন ভোজন ও জীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহার প্রতিবেশিবর্গ পরস্বাপহারী ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দুর্ব্বৃত্ত ও মূর্খ, সে মানব কোটিপতি হইয়াও ক্ষণকালের জন্য সুখানুভব করিতে পারে না; তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। পারিবারিক সুখ এবং প্রতিবেশীদিগের সদ্ব্যবহারই মানবজীবন সার্থক করে। মূর্খ পরিবার এবং দুর্ব্বৃত্ত প্রতিবেশীর মধ্যে যাহার বাস, পশুদিগের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং মানবসুলভ উচ্চবৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিসাধনে তাহার অবকাশ থাকে না।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিলে, ইংরাজরাজ দুর্ব্বৃত্তকে দমন করিয়া এবং জনসাধারণকে সুশিক্ষা দিয়া গার্হস্থ্য-জীবনে যে সুখশান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। লোকশিক্ষার এ প্রকার সুব্যবস্থা এবং শান্তিরক্ষার এমন সুবিধান কোন কালে ভারতে প্রচলিত ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় এক লক্ষ দশ সহস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিদ্যালয় রাজ-উদ্যোগে এবং রাজব্যয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং প্রায় চল্লিশ

লক্ষ ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কেবল বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজকোষ হইতে প্রায় পাঁচ কোটি মুদ্রা প্রতিবৎসরই ব্যয়িত হয়। স্ত্রীশিক্ষাবিধানেও রাজা উদাসীন নহেন; রাজব্যয়ে ছয় হাজারের অধিক বালিকা-বিদ্যালয় নগরে নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গুলির মধ্যে উচ্চশিক্ষাদানের জন্য দশটি কলেজও আছে। সহস্রসহস্র বালিকা এই ব্যবস্থায় সুশিক্ষা লাভ করিয়া সুগৃহিণী হইতেছেন। যে দেশে বালকবালিকাদিগের শিক্ষাদানের এ প্রকার সুব্যবস্থা, সে দেশে যে গার্হস্থ্যজীবন শান্তিময় হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

ভারতের প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক জেলার জনবহুল নগর বা গ্রামে বিচারালয় সংস্থাপন করিয়া ইংরাজরাজ বর্ত্তমান ভারতে যে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব্ব। কোটিপতি ভূম্যধিকারী হইতে পথের ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকল প্রজাই বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে পারে। ইংরাজরাজের ভারতীয় প্রজাদিগের এই অধিকার যে, কত অশান্তির নিরাস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ভারত-সাম্রাজ্যে প্রায় সাত লক্ষ গ্রাম্য শান্তিরক্ষক এবং একলক্ষ ত্রিশ হাজার ছোট-বড় পুলিশ কর্ম্মচারী পরস্বলোলুপ দুর্ব্বৃত্তের দমনে সর্ব্বদাই তৎপর। প্রাচীন কালের দস্যুতস্করাদির ভীষণ অত্যাচারের কথা এক্ষণে সত্যই যেন উপন্যাসের বিষয় হইয়াছে।

প্রজাদিগকে সুশিক্ষা দান করিয়াই রাজা নিবৃত্ত নহেন, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহাতে জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন, তৎপ্রতিও রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। সাধারণ শিক্ষার শেষে যুবকদিগকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের উপযোগী করিবার জন্য ঢাকা, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং লাহোর প্রভৃতি স্থানে শিল্পবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; এবং ঢাকা, পূসা ও দ্বারভাঙ্গায় কৃষিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঢাকা, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের মেডিকেল-কলেজগুলি ভারতবাসীদিগকে আধুনিক উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বা রাজকর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়া পরম সুখে দিনযাপন করিতেছেন। ভারতের সহস্র সহস্র গ্রামে ও নগরে প্রজাগণের সুচিকিৎসার জন্য যে সকল সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতেও গবর্ণমেণ্ট-মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পরম দয়াবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতসাম্রাজ্যের শাসন-ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন, সেই দিন হইতে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ যে অধিকার উপভোগ করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। উপযুক্ত হইলে শিক্ষিত ভারতবাসী যাহাতে রাজকর্ম্মচারিরূপে

উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারে, শাসনভারগ্রহণকালে করুণাময়ী মহারাণী তাহার সুব্যবস্থা করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আদেশবাণী প্রচার করেন। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণের উদার শাসননীতির ফলে সেই অধিকারই এত প্রসার লাভ করিয়াছে যে হাইকোর্টের বিচারপতি, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রভৃতি পদে এক্ষণে বহু সংখ্যক ভারতবাসী সমাসীন আছেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণও ভারতবাসী। রাজপ্রতিনিধির যে মন্ত্রণাসভায় সমগ্র ভারতের জন্য ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং শাসনপদ্ধতির সংস্কার হয়, তাহাও ভারতবাসীর নিকটে অবারিতদ্বার। বহু শিক্ষিত ভারতবাসী এক্ষণে রাজপ্রতিনিধিদিগের ব্যবস্থাসচিবপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইংলণ্ডে ভারতসচিব মহোদয়ের যে সভা আছে তাহাতেও বহু ভারতবাসী প্রবেশ লাভ করিয়া রাজকার্য্যের সহায়তা করিতেছেন।

রেলপথের বিস্তার, ডাকের সুব্যবস্থা এবং বৈদ্যুতবার্ত্তাবহনপ্রথায় ভারতবাসিগণ বাণিজ্যের যে উন্নতি করিতেছেন, তাহাও বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম বিশেষত্ব।

আমরা এক্ষণে যাহাকে রাজপথ বলিয়া আখ্যাত করি সে প্রকার পথ ইংরাজরাজ শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সময়ে মির্জ্জাপুর হইতে দক্ষিণভারতে গমনাগমন করিবার পথটি সুদীর্ঘ বলিয়া খ্যাত ছিল। এতদ্ব্যতীত আগরা হইতে আজমীর,

এলাহাবাদ হইতে জববলপুর এবং দিল্লী হইতে এলাহাবাদ ও-পাটনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কয়েকটি দীর্ঘ পথ এবং অমরকীর্ত্তি শের শাহের নির্ম্মিত গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্ দেশবিদেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিত। পথগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ পথিমধ্যে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখিতেন। ব্যবসায়িগণ গোযান ও ভারবাহী অশ্ব প্রভৃতি পশুর পৃষ্ঠে ব্যবসায়ের দ্রব্যজাত চাপাইয়া দলে দলে বিদেশযাত্রা করিত। বলা বাহুল্য, পণ্যবহনের এই প্রকার ব্যবস্থা নিরাপদ ছিল না; দস্যুতস্করের উপদ্রবে অনেকেরই সর্ব্বনাশ হইত। তখন এ দেশে বৈদ্যুৎবার্ত্তাবহন-প্রথার প্রচলন ছিল না; উৎপাতের সংবাদ রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই দস্যুরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিত।

ইংরাজরাজের চেষ্টায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের যে দিন ভারতে প্রথম রেলপথের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়, সেই দিন হইতে ব্যবসায়ী ও পথিকদিগের সকল বিপদ্ একে একে দূর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে কেবল পাঁচ হাজার মাইল রেলপথের নির্ম্মাণ হয়; এক্ষণ তাহাই প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, সমগ্র সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বণিগ্‌গণ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বহুমূল্য দ্রব্যজাত প্রেরণ করিয়া কেমন নিশ্চিন্ত-ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। অষ্টবিংশতি মণ দ্রব্য রেলযোগে অর্দ্ধক্রোশ লইয়া যাইতে

এক্ষণে কখনই দু পয়সার অধিক ব্যয় হয় না। ব্যবসায়দ্রব্য বহনের এই সুব্যবস্থায় ভারতের বণিক্‌সম্প্রদায় যেমন লাভবান্ হইতেছেন, অধিবাসিগণও বিদেশজাত নানা প্রয়োজনীয় বস্তু পাইয়া তেমনি সুবিধা ভোগ করিতেছেন। রেলপথ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব এবং কাশ্মীর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানগুলির সহিত আমাদের এত অল্প পরিচয় ছিল যে, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণ কোন্ ভাষায় কথোপকথন করেন, এবং তাহাদের দেশের অবস্থাই বা কি প্রকার, আমরা তাহা জানিতাম না। দিল্লী, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরগুলিও আমাদিগের শৈশবোপাখ্যানের রাজপুরীর ন্যায় রহস্যময় ছিল। সম্প্রতি রেলপথের বিস্তারের সহিত অল্প ব্যয়ে এবং নিরাপদে দূর দেশে যাতায়াতের সুযোগ হওয়ায়, ভারতের অধিবাসিবর্গের যে, কত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই সকল সুযোগ যে, কোন কালে উপস্থিত হইবে, এক শত বৎসর পূর্ব্বেও কোন ভারতবাসী তাহা মনে করিতে পারিতেন না।

দূরদেশস্থিত অধিবাসীদিগের সহিত সংবাদ আদান প্রদানের কোন সুবিধা না থাকায়, পূর্ব্বে ব্যবসায়ের উন্নতি বা বিদ্যার্জ্জনের জন্য কোন ভারতবাসী সহসা গৃহত্যাগ করিতেন না; অধুনা স্বল্প ব্যয়ে পত্র আদানপ্রদানের সুবিধা হওয়ায়, সেই ভাব ক্রমেই দূর হইয়া যাইতেছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ ভারতে ডাকবিভাগের প্রতিষ্ঠা

করিলে রাজকীয় পত্রাদির সহিত জনগণেরও পত্রাদি বহন করা হইত, এবং দূরত্বানুসারে অগ্রিমমাশুল গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। এই হিসাবে কলিকাতা হইতে আগরায় পত্র পাঠাইতে প্রেরকের বার আনা ব্যয় হইত। এক্ষণে সেই 'ডাকবিভাগ' এত উন্নত হইয়াছে যে, কেবল দুই পয়সা ব্যয়ে ভারতের যে কোন অংশে পত্র প্রেরিত হইতেছে, এবং প্রয়োজন হইলে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৈদ্যুত-তারযোগে সংবাদের আদান প্রদান চলিতেছে। অধুনা প্রায় ষোল হাজার ডাকঘরে সহস্র সহস্র কর্ম্মচারী ভারতবাসীদিগের প্রেরিত পত্রাদি সুব্যবস্থায় যথাস্থানে প্রেরণে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমান ভারতের অধিবাসিগণ যে, প্রিয়জন পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্বেগে দূরে অবস্থান করিবেন, এবং নানা দেশ হইতে বিবিধ বিদ্যা, জ্ঞান ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পারিবারিক সুখ উপভোগ করিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

মাতাপিতা নিঃসহায় সন্তানের যেমন পরম আশ্রয়, সঙ্কটাপন্ন প্রজাগণের রাজাই সেইরূপ পরম অবলম্বন। সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে দৈবোৎপাত, মহামারী বা দুর্ভিক্ষের আকার গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই সময়ে রাজা মাতাপিতার ন্যায় পীড়িতের শুশ্রূষা এবং অনাহারক্লিষ্টের আহারের ব্যবস্থা না করিলে প্রজাগণের উদ্ধারের আর উপায় থাকে না। ভারতসাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রজা একাধিকবার দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া এই প্রকার সঙ্কটে পড়িয়াছে ; এবং প্রত্যেকবারেই যে সুব্যবস্থায় তাহারা রাজানুকূল্য লাভ

করিয়াছে, তাহা কেবল বর্ত্তমান ভারতেই সম্ভব। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী নিঃসম্বল কৃষিজীবী; কোন বৎসরে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলেই ক্ষেত্রে শস্য জন্মে না, সুতরাং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

দুর্ভিক্ষের এই আকস্মিক আবির্ভাব নিবারণে মানবী শক্তিকে অসমর্থ দেখিয়া রাজপ্রতিনিধিগণ এই ভীষণ রাক্ষসের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। প্রতি-বৎসর রাজকোষ হইতে নির্দ্দিষ্টপরিমাণ অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িত-দিগের সাহায্যার্থে পৃথক্ ভাবে রক্ষা করা হয়। যাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ জেলার শস্যাদির অবস্থার বিবরণ প্রতিসপ্তাহের শেষে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের নিকট প্রেরণ করেন, তাহারও সুব্যবস্থা করা হয়। এই সকল বিবরণ হইতে কোন স্থানে অন্ন-কষ্টের সম্ভাবনা প্রকাশ হইলে, দরিদ্র প্রজাদিগকে সাহায্যদানের আয়োজন চলিতে থাকে। তাহার পরে যথার্থ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, নূতন রাজপথাদির নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে দরিদ্রপ্রজা-দিগকে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক-দান আরব্ধ হয়।

দুর্ভিক্ষ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিলে, এই প্রকার সাহায্য যথেষ্ট হয় না। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এবং তাঁহার সহকারী-দিগের তত্ত্বাবধানে স্থানে স্থানে অন্নসত্র এবং সাহায্যভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক সময়েই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তণ্ডুল ও অন্নবিতরণকার্য্য স্বয়ং পরিদর্শন করেন, এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ অপর রাজকার্য্য হইতে বিরত হইয়া দুর্গমস্থানের

দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের অবস্থাদর্শনে বহির্গত হয়েন। বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের যে অংশে যে খাদ্য পাওয়া যায়, রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া রেল ও ষ্টীমারযোগে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন; রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীও তখন রাজাদেশে দুর্ভিক্ষপীড়িতের খাদ্যপ্রেরণের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিয়া পরে অপর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, আজমীর ও পঞ্জাবের কিয়দংশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে প্রায় ষড়্‌বিংশতি লক্ষ নিঃসহায় ব্যক্তি রাজার কৃপায় জীবনলাভ করিয়াছিল। ইহাতে রাজকোষ হইতে প্রায় দশকোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

যে খৃষ্টান সাধুগণ ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে নগরে নগরে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই সঙ্কটকালে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া এবং অনাহারক্লিষ্টদিগকে আহার্য্য ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া ইঁহারা যে কত দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারী ও শিশুর জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহা গণনাতীত।

রাজা দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জীবনদানের এই সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। রাজপ্রতিনিধি ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা সংবাদের আদানপ্রদান চলিতে থাকে। করুণহৃদয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং শান্তিপ্রিয় প্রজাবৎসল সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্ এই-

প্রকার দৈববিপদে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধি-দিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের আন্তরিক প্রজাহিতৈষণার জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনিবার্য্য কারণে ভূমণ্ডলব্যাপী বৃহৎ সাম্রাজ্যের কোন অংশে প্রজাবৃন্দের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই প্রজাদুঃখকাতরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইত, এবং প্রজার বিপদ্‌কে পারিবারিক বিপদ্‌জ্ঞানে সাশ্রুনয়নে পরমেশ্বরের নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেন। স্বয়ং ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য তিনি জনৈক সুপণ্ডিত ভারতীয় মুসলমান মৌলবী নিযুক্ত রাখিয়া উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণকামী রাজা শাসনসৌকর্য্যের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, প্রজাবৃন্দের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সতত আগ্রহ থাকে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি একবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দেশবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান সদাশয় সম্রাট্ সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্ব্বে একবার এবং সাম্রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, সৌজন্য ও দানশীলতা ভারতীয় প্রজাসমূহ কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিবে না। শিক্ষাবিস্তারকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া তিনি তাঁহার মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি

কলিকাতায় সাধারণবেশে নগরভ্রমণ করিয়া কত দীন দরিদ্রের সহিত আলাপ করিয়াছেন। দিল্লীনগরে অতি সমারোহে তাঁহার অভিষেকোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে; সেইদিন ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও প্রজাসমূহ তাঁহার রাজচ্ছত্রতলে আপনাদের সম্মিলিত শক্তি অনুভব করিয়া সাধুচরিত্র সম্রাটের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়াছিলেন।

এইরূপে রাজা ও প্রজা, এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুখে দুঃখে যে হৃদয়ের যোগ দেখা যায় তাহা বর্ত্তমান ভারতের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখযোগ্য।

জ্ঞান-সোপান।

পদ্যাংশ

প্রার্থনা।

ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল,
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।
স্বামিন্, নিদেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া,
তোমারি নির্দ্দিষ্ট করি কাজ,—
ছোট হোক্ বড় হোক্ পরের নয়নে
পড়ুক্ বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ?

তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হ'য়ে
বিলাইব বিভব তোমার;
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,—
তুমি দে'ছ যেটুকুর ভার।

ভুলে যাই আপনারে, যশঃ অপবাদ
কভু যেন স্মরণে না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভরের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

মাতৃদেবী।

মা আমার স্নেহময়ি করুণারূপিণি !
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার ?
স্নেহের মূরতিরূপে আছ গো জননী,
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত—অপার।

"মা" কথা মধুর কিবা আরামদায়িনী।
রোগশয্যা'পরে কিংবা দূর পরবাসে,
উদ্দেশে "মা" বলে আমি ডাকি গো যখনি,
শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে।

হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত
রয়েছ মা, ঝরিয়াছে কত অশ্রুনীর,
শ্রাবণের ধারা সম হায়, অবিরত !

মহাবীর কিংবা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,
থাকিব, থাকিব আমি জানি, স্নেহময়ি,
স্নেহের পুতুল সম তোমার নিকটে।

লোকমুখে শুনি' মম সুযশের বাণী,
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ ;

পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি
শেল সম বিঁধে হৃদে ঘটে পরমাদ।

এমন স্নেহের শোধ কেবা দিতে পারে?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজি যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন।

প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগতজননী
প্রতিনিধি তাঁর তুমি জগত-মাঝারে,
নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবস যামিনী,
তাঁর প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতেছ আমারে।

তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার
গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
—জ্ঞানহীন অন্ধ আমি কি বলিব আর?—
তেমতি তোমাতে মাগো তাঁহার প্রকাশ।

বৃথা বস্তু।

বৃথা সে সুদুরারোহ মহীরুহ ফল,
বঞ্চিত যাহার স্বাদে মনুজ সকল।
বৃথা সে অমৃত-ভাষ-ভাষিণী রসনা,
না হয় যাহাতে সত্য মহিমা ঘোষণা।
বৃথা সে কৃপণ-করতল-স্থিত ধন,
জগতের হিত যায় না হয় কখন।
অর্জ্জিত বিদ্যায় বল কিবা ফল তার,
বিদ্যা-অনুরূপ নহে ব্যবহার যার।
বল বল সে বলীকে বলী কেবা কয়—
কার্য্যকালে যার বল কার্য্যকরী নয়?
বিবেক বিজ্ঞানে বল কিবা ফল তার,
সৎ-ক্রিয়া-সাহস নাই মনেতে যাহার?
বল তার জীবনেতে কিবা প্রয়োজন,
জীবন-সাফল্যলাভে বিমুখ যে জন?

শরতের বঙ্গ।

আজি কি তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে!

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার
আটি আটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম পথে পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীলবরণী
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী!
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
নানা দেশ হ'তে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জল-হারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী!
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে*
কুসুম-ভূষণ-জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী!

* হরিতে—হরিদ্বর্ণে; হিরণে—স্বর্ণবর্ণে।

জীবন-সঙ্গীত।

বলো না কাতরস্বরে— বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা, পুত্র, পরিবার, তুমি কার, কে তোমার—
বলে' জীব করো না ক্রন্দন।
মানব-জীবন সার, এমন পাবে না আর ;
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয় ;
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুঃখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ ;
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায়, ক্ষণ যায় সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায় সম্পদ্ বল সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হ'ও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হ'ও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্,
সংকল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার—বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয় !
সময়-সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব হে অমর।
সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে।
সংকল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

রসাল ও স্বর্ণলতিকা।

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে,—
“শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে!
নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই ক্ষুদ্র কায়া করি সৃজিলা তোমারে।
মলয় বহিলে হায়, নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড়লো হেলিয়া!
বনবৃক্ষ-কুল-স্বামী, হিমাদ্রি সদৃশ আমি,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া!

কালাগ্নির মত তপ্ত তপন-তাপন
আমি কিলো ডরাই কখন?
দূরে রাখি গাভীদলে, রাখাল আমার তলে,
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ;
শুন, ধনি, রাজ-কার্য্য দরিদ্রপালন!
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথগামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়, কেহ পড়ি নিদ্রা যায়,
এ রাজ-চরণে
শীতলিয়া মোর ডরে, সদা আসি' সেবা করে,
মোর অতিথির হেথা আপনি পবনে।

মধুমাখা ফল মম বিখ্যাত ভুবনে
তুমি কি তা জান না ললনে ?
দেখ মোর শাখারাশি, কত পাখী বাঁধে আসি'
বাসা এ আগারে।
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুঃখ দেখি' নিত্য আমি দুখী
নিন্দ বিধাতায়, তুমি নিন্দ বিধুমুখী !"

নীরবিলা তরুরাজ ; উড়িল গগনে
যতদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন, সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে !
মহাঘাতে মড়মড়ি, রসাল ভূতলে পড়ি
হায়, বায়ুবলে
হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে !
উচ্চশির যদি তুমি কুল-মান ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে,
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে।

———

সালেহ রাজার কথা।

(সাদির বুঁস্তা হইতে)

তুরস্ক দেশে প্রতাপান্বিত সালে' নামে নরপতি,
হর্ম্ম্যশোভন রাজধানী তাঁর নয়নাভিরাম অতি।
রাজে উজ্জ্বল রতন-খচিত পাষাণ-প্রাসাদ তাঁর,
ঝালরে ঝলিত ছাদেরে ঘেরিয়া দাঁড়ায় স্তম্ভসার।
গোলাপ জলের উৎস প্রাসাদ-কানন-কুঞ্জে মাতে,
বহয়ে তাহার সুরভি সমীর জানালাতে জানালাতে!

এত সম্পদ্মাঝেও রাজার চিতে নাহি কোন সুখ,
সকালে ও সাঁঝে রাজপথ-মাঝে বোর্কায় ঢাকি মুখ—
কভু বিপণীতে কভু পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ান একা,
কি গ্রীষ্ম শীত, সকলি সমান—চরণ ধূলিতে মাখা।
গায়ের উপরে ঠেলিয়া পথিক পাশ দিয়া চলি যায়,
সবার সঙ্গে রাজা যান ঠেলি—ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়!

একদা প্রভাতে মস্‌জিদে গিয়া হেরেন হঠাৎ ভূপ,
দুজন ফকির শীতে জড়সড় ক্লিষ্ট কাতর-রূপ;
নগ্ন চরণ, ছিন্ন বসন, হিহি করি কাঁপে শীতে,
চেয়ে আছে কবে উদিবে সূর্য্য উৎকণ্ঠিতচিতে।
তখনো রাতির নিকষে পড়েনি উষার সোণার রেখা,
নগর-সৌধ-সুবর্ণ-চূড়া তখনো দেয়নি দেখা!

দুজনে মিলিয়া করিছে আলাপ রাজার কাণে তা' গেল—
"এতদিন ধরি সহিলাম ক্লেশ, কি ফল তাহাতে এল ?
সুখে আছে রাজা বাদ্‌শারা, তারা স্বর্গে ইহার পরে,
করিবে দিব্য আনন্দ ভোগ! তবে এ ধর্ম্মতরে
এত দুঃখের কোন্ প্রয়োজন? স্বর্গ রাজাও পাবে ;—
এমনি সুলভ যদি রে স্বর্গ কে তবে সেথায় যাবে ?

"আমি তো কবর হ'তে তাহা হ'লে তুলিব না মাথা ভাই,
কিবা আসে যায় এমন স্বর্গ পাই কি বা নাহি পাই ?
সত্যই বলি, স্বর্গকাননে সালেহরে যদি হেরি
পাদুকায় তার আরাম-কোমল মাথা দিব গুঁড়া করি।
এখনি কেমন কুসুম-পেলব শয়নে সে রাতি যাপে,
শীতের তীব্র তীক্ষ্ণ বাতাসে আমাদের প্রাণ কাঁপে!"

শুনিয়া সালেহ ফকীরবচন প্রাসাদে গেলেন ফিরি,
মনে হ'ল তাঁর, মিথ্যা ও ফাঁকি দুনিয়া-বাদশাগিরি!
তখনি বারেক হইল বাসনা সন্ন্যাসিদ্বয়ে ডাকি,
তা'দের বসায়ে রাজার আসনে বুঝান কি যে এ ফাঁকি ;
সুখ সমৃদ্ধি কত যে শূন্য, বিলাসে কি হাহাকার,
কি দুর্ভাগা যে নরপতি তার অন্তরে কি যে ভার।

দূত গিয়া ত্বরা ফকীর দুজনে সভায় ডাকিয়া আনে—
রতন-আসনে বসান তাদের নৃপতি সসম্মানে।

সুগন্ধময় সুপরিচ্ছদ পরিয়া রাজার পাশে
বসিয়া তাঁহারা স্মরি নিজ কথা মরেন বিষম ত্রাসে।
যোড়কর করি কহেন, "রাজন্, অভাজন মোরা অতি
মান্যের ছলে পরিহাস কভু সাজে কি মোদের প্রতি?"

রাজা হাসি কন্, "প্রভু, পরিহাস আমারেই আমি করি
দৈন্য যে আছে লুকাবার লাগি রাজার এ বেশ পরি!
স্বর্গ দুখীর জানি ব'লে আমি ঘুরি রাজবেশ ছাড়ি;
তোমাদেরি মাঝে স্বর্গ যে মোর, সে স্বর্গ লবে কাড়ি?"
শুনি' লজ্জায় সন্ন্যাসীদের মুখে নাহি কথা সরে—
সুখে যে বিরাগী সেই দরবেশ বুঝিল ইহার পরে।

দশরথের প্রতি কেকয়ী।

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়িকা?
কেন এত বীণাধ্বনি? কহ, দেব, শুনি—
কৃপা করি কহ মোরে;—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ? কহ হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে?

কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে* ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর অভিমুখে ? রঘু-কুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি।
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্মশব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ ; কিংবা দিয়া চূণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে ; যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে,
দেব-নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয় !
তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,

* স্বস্ত্যয়ন—গ্রহ-শান্তির নিমিত্ত মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

যুবরাজ পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারতরত্ন, রঘুচূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা, এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি,
গুণশীলোত্তম রাম, কহ কোন্ গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর দেব, কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে* কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে

* বিতংস—পক্ষিবন্ধন-রজ্জু।

ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল; দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি। দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি!

মৃত্যুর প্রতি ধার্ম্মিকের উক্তি।

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন,
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে,
চিরবাসস্থান ব'লে ভাবে মনে মনে;
পাপরূপ-পিশাচ যাদের হৃদাসন,
করি আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়;
পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয়;—
হেরিলে নয়নে ওই ভ্রূকুটি তোমার,
তাহাদের হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন!
যে অম্লান কুসুমের মধুপান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনমধুকরে!
যে নিত্য-উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি* নিশ্চিত;
কোনরূপে তোমায় করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

---

* পথ।

প্রকৃতির শোভা।

একদা নিদাঘকালে নিশীথ-সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।
উত্তাল-তরঙ্গময় সাগর-সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
নির্ব্বাত-তড়াগ সম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্ত-দরশন।
তরূপরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সু-ধারা ঢালে শ্রবণবিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতির আস্য-ভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ্ টাপ্ পড়িছে শিশির-বিন্দুচয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।

চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা সঙ্কাশে ;
যেন নীল-চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে।
অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে ;
বিকসিত কামিনী-কুসুম তরুতলে,
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল-নীরময়ী মৃদুলগামিনী,
মন্দ মন্দ-বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হেলে,
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।
শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায় !
কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুল-ডাল হেলিয়া রয়েছে।
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল-ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণভরে।

থেকে থেকে গুপ্ গাপ্ করে মৎস্যগণ,
সে রব শ্রবণে হয় মোহিত শ্রবণ।
সারি সারি তরণী দু-ধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।
এইরূপে প্রকৃতির রূপ-দরশনে,
অহো! কি বিমল সুখ উপজিল মনে!
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।
মনে মনে কহিলাম—অয়ি সুপ্রকৃতে!
শোভনে! বিচিত্র-চারু-ভূষণ-ভূষিতে!
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মূরতি,
নিরখি নয়নে হল জড়প্রায় মতি!
অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।
যখন প্রাবৃট্কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল;
ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীম রবে গরজে গভীর;
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে;

কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে ;
তখন তোমার চারুরূপ দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব-পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন ;
ফুল্ল ফুল দূর্ব্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্যবদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত,
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?
এইরূপ যে সময় যেই রূপ ধর,
তাতেই তখন ভব-জন-মন হর।
সাধে কি গো কত মহা মহা কবিবর,
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর ;
গভীর অরণ্যে, ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরি-শিখর গহ্বরে ;
হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন,
অনুক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ ?
সাধে কি গো সুকোমল শয্যা পরিহরি,
তটিনীর তীরে তাঁরা আগমন করি,
তরুতলে ধরাসনে কুতূহলে বসি,
তব রূপ-দরশনে কাটান তামসী ?

সাধে কি গো কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছভাবে অট্টালিকা, স্তম্ভ সুশোভন,
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্ম্মুহু পুলকাশ্রু করে বরিষণ ?
ধিক্ সে মানবগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্ !
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক ;
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্য পানে ফিরিয়া না চায় !
উদ্যান বিপিন গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন ;
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ ;
বিফল তাদের জন্ম বিফল জীবন,
কখন না দেখে তারা সুখের বদন।
ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর !
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর।
বিচিত্র কৌশল তাঁর অনন্ত শকতি,
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বল গো শোভনে অয়ি প্রকৃতি-সুন্দরি !
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী ?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার ?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর ?

চন্দ্র।

ভুবনমোহন রূপ ধর তুমি শশি!
তোমার কৌমুদীরাশি তামসীর তম নাশি,
কেমন সাজায় তারে মোহিনী রূপসী!
পরায় সোনার হার নদীর গলায়,
সৈকত* পুলিনে তার চুমকি বসায়!
নভ-নীল-হ্রদে তুমি হীরার কমল!
পুঞ্জ পুঞ্জ মধুব্রত মকরন্দ পানে রত,
তাই কি নিয়ত কোলে কালিমা কেবল?
রবির তোমাতে দেখি বড়ই সোহাগ,
নিজ করে সদা ক'রে দেয় অঙ্গরাগ†।
ললিত-লাবণ্যে তব জুড়ায় নয়ন!
উদিলে গগন তলে শিশুগণ কুতূহলে,
অনিমিষে তোমাপানে করে বিলোকন!
আদরে প্রসূতি ডাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
মণির কপালে তার চিক্ দিয়ে যেতে।
সবাই তোমারে ভালবাসে শশধর!
নির্ম্মল চাঁদিনী রাতে বাঁশরী লইয়া হাতে
রাখাল বাজায় কিবা সুললিত স্বর!
নীরব নিশায় অই বাঁশরীর স্বরে
অমিয়ের ধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।

---

* বালুকাময়।

† সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে লোকের নয়নগোচর হয়। চন্দ্র স্বয়ং উজ্জ্বল নহে।

বিভ্রম ঘটাতে তুমি বড়ই চতুর,
বিভাবরী দ্বিপ্রহরে, দিনমান মনে করে
আধো ঘুম-চোখে পিক কুহরে মধুর।
নীরে ক্ষীর ভাবি লুব্ধ মার্জ্জারের মন ;
বিটপে বিকট ভূত দেখে ভীরু জন !
বহুরূপী ইন্দু তুমি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে,
কভু বক্ররেখাসম, কভু অর্দ্ধবৃত্তোপম,
কভু বা বর্ত্তুল-দেহে উঠ নভস্তলে ;
কভু তব অদর্শনে অমা-নিশীথিনী
গলিত-চিকুর-ভারে কাঁদে অনাথিনী।*
রঙ্গরসে সুরসিক চন্দ্র তুমি বট,
এই স্ফুট হাস হাসি, তব সুধা-অভিলাষী
চকোর নিকটে চির-প্রণয় প্রকট,
আবার মেঘের আড়ে লুকায়ে মুরতি,
প্রকাশ কপট কোপ অনুগত প্রতি।
কলঙ্কী শশাঙ্ক তুমি জগতে প্রচার !
নিশাভাগে নিরজনে, কাহারো কোমল মনে
কভু কি বিষণ্ণ ভাব কর হে সঞ্চার ?
তব হিমকরে বাড়ে দেহতাপ যার,
সে জানে পাষাণে গাঁথা হৃদয় তোমার। †

* এ স্থলে অন্ধকারকে রজনীর চুল বর্ণনা করা হইতেছে।

† প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোকে যে ব্যক্তি কাতর, চন্দ্রদর্শনে তাহার শোক আরও বর্দ্ধিত হয়।

ও কলঙ্ক কলানিধি ধরি না তোমার,
সাগর মথিত হলে, উগারিল হলাহলে,
তবু রত্নাকর নাম প্রথিত তাহার।
যে জ্বলে জ্বলুক তব কিরণ-গরলে,
সুধাকর নাম তবু ঘোষিবে সকলে।

রাজর্ষি নসিরুদ্দিন।

সার্দ্ধষট্‌শতাব্দীর অসংখ্য দিবসচয়
একে একে ফুটি উঠি আবার পেয়েছে লয়।—
কত বার কত ভাবে ঊষার অমল হাসি
অরুণ হরষভরে দূর ক'রে তমোরাশি
ছড়ায়ে পড়েছে ধীরে ধরণীর সারা গায় ;—
সন্ধ্যার জলদ কত, কষিত কনককায়,
বিলীন হইয়া গেছে রজনীর অন্ধকারে ;—
পর পর ষড়ঋতু বর্ষে বর্ষে বারে বারে
ধরণীর জীর্ণ চীর করিয়া দিয়াছে দূর,—
কমিতে দেয়নি কিছু রাখিয়াছে ভরপূর,
হে রাজর্ষি, তুমি গেছ পরে! আজো তব নাম
ইতিহাস উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছে অবিরাম!
মসীলিপ্ত অতীতের ভেদি অন্ধ কোলাহল
ভেসে উঠে মূর্ত্তি তাঁর কি ভাস্বর! কি উজ্জ্বল!

কোরাণ-নকল-রত শান্ত সে মূরতিখানি
দেখি—শুধু চেয়ে দেখি অনন্ত বিস্ময় মানি।
চারিভিতে গ্রন্থরাশি পাঠের আগারমাঝে
বসিয়া নসিরুদ্দিন জ্ঞানের সাধক-সাজে।
কি আনন্দে মগ্ন যোগী! কঠোর সে সাধনায়
স্বরগের সুধাধারা হৃদিমাঝে বয়ে যায়।
আননে উঠেছে ফুটি পবিত্র উজ্জল হাসি ;—
বসিয়া নসিরুদ্দিন চারি ভিতে গ্রন্থরাশি।
সহসা তুলিয়া মুখ কঙ্কণের ঝণৎকারে
দেখেন নসিরুদ্দিন বেগম দাঁড়ায়ে দূরে।
ফুল্ল পারিজাতসম হাসি হাসি মুখখানি,—
কে যেন দিয়েছে তায় বিষাদ-কালিমা টানি।
পড়িতেছে গণ্ড বহি দরবিগলিত ধারা,
নতমুখে মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা।
অতি সন্তর্পণে রাখি ক্রোড় হ'তে বহিখানি
চলিলা নসিরুদ্দিন যেথা ছিল মহারাণী।
আদরে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমলস্বরে
বলিলেন, "প্রিয়তমে, কি হয়েছে বল মোরে।"
স্বামীর আদরে অশ্রু আরো দ্রুতধারে বয়,
ভাবাবেগে মহারাণী নিশ্চল নির্ব্বাক্ রয়।
বহুক্ষণ পরে শেষে বলিতে লাগিল ধীরে
অতীব বিষণ্ণ প্রাণে অতীব কাতরস্বরে,—

"জাঁহাপনা, শেষ বাঁদী যে ছিল আমার তরে,
তোমার আদেশে আজি বিদায় দিয়েছি তারে,
কিন্তু প্রভু! কি বলিব, তোমার আহার তরে,
সেকিতেছিলাম রুটী হাত মোর গেছে পুড়ে,
নষ্ট হয়ে গেছে রুটী কাঁদিতেছিলাম তাই;
তোমার আহার তরে আর ঘরে কিছু নাই।
বিশাল এ ভারতের সম্রাট্ আমার স্বামী,
একটি বাঁদীও কি গো পেতে নাহি পারি আমি?
পুড়েছে আমার হাত তুমি রবে অনাহারে,
অগণিত ধনরত্ন রাজকোষে কার তরে?"
থামিলেন মহারাণী, সম্রাট্ বলিল ধীরে,
"মহারাণি, কাঁদিতেছ শুধু তুমি এরি তরে?
হাত পুড়িয়াছে তব মোর হাত আছে ঠিক,
এর জন্য এত কাঁদা? ছি ছি মহারাণি ধিক্!
তুমি যদি নাহি পার করিবারে গৃহকাজ,
নিজ হস্তে লব তাহা, আমিই করিব আজ।
আমি ভেবেছিনু বুঝি অঙ্গ বঙ্গ উড়িষ্যায়,
দারুণ-দুর্ভিক্ষ ক্লেশে বহু লোক মারা যায়,
তারি জন্য বুঝি তুমি কাঁদিতেছ গৃহ-কোণে,
প্রজাদের দুঃখ বুঝি বিষম বেজেছে প্রাণে।
প্রিয়তমে, এই দুঃখে এ ভাবে কাঁদিতে আছে?
ভাব দেখি তোমা চেয়ে কত দুঃখী দেশমাঝে

সদা নিদারুণ দুঃখে করিতেছে হাহাকার!
তুমি কাঁদিতেছ ভাবি একবেলা অনাহার?
অগণিত ধন-রত্ন রাজার ভাণ্ডারে আছে,
আমার ভাণ্ডারে নয় তার পানে চাওয়া মিছে।
আমি ত প্রহরী মাত্র নাহি মোর অধিকার
সে ধনের কণামাত্র, করিবারে ব্যবহার।
প্রত্যহ কোরাণ লিখি' করি যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতেই দু'জনার চলে গ্রাস-আচ্ছাদন।
পরধনে লোভ করা, সে কি ভাল মহারাণি?
তোমার স্বভাব নয়, আমি তাহা ভাল জানি।
নিরুৎসাহ না হইও, মনে রেখো দিনমান
মাথার উপরে থাকি দেখিছেন ভগবান্।"
থামিলেন বাদশাহ, বেগমের ক্লিষ্ট মুখে
ফুটিল স্বরগ-আভা, হরষ ভাসাল দুখে।
গিয়াছে সে মহাজন অতীতে পাইয়া লয়,
সে পুণ্য চরিত আজো ঘোষিতেছে ধরাময়।